# শেষ বৈঠক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরম স্নেহের

পুত্রবধূ

**শ্রীগোপা গঙ্গোপাধ্যায়**

কল্যাণীয়াসু

## লেখকের গ্রন্থাবলী

বিদ্রোহী ভার্য্যা ( ৪র্থ সংস্করণ )
শশিনাথ ( ৩য় সংস্করণ )
রাজপথ ( ৭ম সংস্করণ )
ছদ্মবেশী ( ৫ম সংস্করণ )
অমলা ( ৩য় সংস্করণ )
অভিজ্ঞান ( ৩য় সংস্করণ )
অন্তরাগ ( ৩য় সংস্করণ )
অমূল তরু ( ৪র্থ সংস্করণ )
দিকশূল ( ৩য় সংস্করণ )
যৌতুক ( ২য় সংস্করণ )
একই বৃন্ত ( ২য় সংস্করণ )
আশাবরী ( ৩য় সংস্করণ )
রাতজাগা ( ২য় সংস্করণ )
শ্রেষ্ঠ গল্প
সোনালী রঙ ( ২য় সংস্করণ )
স্মৃতিকথা ১ম খণ্ড ( ২য় সংস্করণ )
স্মৃতিকথা ২য় খণ্ড
স্মৃতিকথা ৩য় খণ্ড
স্মৃতিকথা ৪র্থ খণ্ড
মায়াবতী পথে
সাত দিন
নাস্তিক
নবগ্রহ
গিরিকা
কমিউনিস্ট প্রিয়া
ভারত-মঙ্গল ( নাটক )
রাজপথ ( নাটক )
বিগত দিন
শেষ বৈঠক

১

আমার ঘরে মাঝে মাঝে বৈঠক বসে। কোনদিন সাহিত্যের, কোনদিন সঙ্গীতের, কোনদিন অন্য কিছুর, কোনদিন বা সব-কিছুর।

প্রকৃতি অনুসাবে জাত। আড্ডাধারী ব'লে জীবনের অনেকখানি অংশ বৈঠকে ব'সে কাটিয়েছি। কিছুটা অপরের বৈঠকে; আর, অনেকটা নিজের বৈঠকে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে অপরের বৈঠকে বড় একটা গতিবিধি রাখি নি, যদিও তারপরও মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকে হাজিরা দিয়েছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈঠককে ত ঠিক বৈঠক বলা চলে না; সে বৈঠকের চাল ছিল দরবারি-টোড়ির, আমাদের বৈঠকের কাফি-সিন্ধুর।

আমার গৃহে আম ও খাস দুটি বৈঠকের ব্যবস্থা আছে। আম-বৈঠক একতলায় সাধারণ মেলামেশার জন্যে; আর খাস-বৈঠক আম-বৈঠকের ঠিক মাথার উপর, অর্থাৎ দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে। যে বৈঠকের কথা লিখতে বসেছি তা প্রধানত দ্বিতলের প্রকোষ্ঠের, কিন্তু অবস্থাগতিকে সময়ে সময়ে খাস-বৈঠকেব অধিবেশন প্রসারিত হয়ে নেমে যায় একতলার আম-বৈঠকের ঘরে।

আমার ঘর দরবারের মতো প্রশস্ত ত নয়ই, বৈঠকের হিসেবেও অপ্রশস্ত। কিন্তু বৈঠক জমে এখানে ভালই। একটা কথা আছে, যদি হয় সুজন একঘরে ন জন, আর যদি হয় কুজন ন ঘরে ন জন। সৌভাগ্যক্রমে আমার ঘরে যাঁরা আড্ডা জমাতে আসেন তাঁরা

সকলেই সুজন, সুতরাং আড্ডা জমে ; এমন কি, কদাচিৎ দৈবক্রমে ন জনের বেশী এসে জমলেও জমে।

ছোট হ'লেও আমার ঘরের সদ্‌গুণও কিছু-কিছু আছে। ঘরের পক্ষে সর্বপ্রধান যে দুটি গুণ—আলো ও হাওয়া, তা এ ঘরে প্রচুর। দ্বিতলের অগ্নিকোণে অবস্থিত ব'লে ঘরখানির দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক খোলা। সুতরাং শীতকালে দক্ষিণ দিকের তিনটি গবাক্ষ দিয়ে উদয়াস্ত, এবং গ্রীষ্মকালে পূর্বদিকের জোড়া জানলা দিয়ে প্রত্যূষের ক্ষণকাল সূর্যকর প্রবেশ করে। গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে না উঠতেই দিনান্তরম্য রৌদ্র আমার খাট ছেড়ে ঘরের মেঝের উপর নেমে যায় ; আর, শীতকালে সমস্ত দিন ধ'রে সততসুখদ উষ্ণতার আবহাওয়ায় ঘরকে স্পৃহণীয় ক'রে রাখে।

তারপর হাওয়ার কথা। রিবেট থেকে বঞ্চিত না হবার উদ্বেগে যে হাওয়ার বিল শোধ করবার জন্যে মাসে মাসে হাওয়া-অফিস অভিমুখে ছুটতে হয় না, সেই দক্ষিণে এবং পূবে হাওয়ার প্রাচুর্যের উপদ্রবে অন্তত এক গণ্ডা কাগজ-চাপা নিয়ে না বসলে আমার ঘরে কাজ করা অসম্ভব। হাওয়া আসে কখনও দমকা বেগে, কখনও ফুরফুরে চালে। দমকা বেগকে তবু পার আছে, ঘরে ঢোকবার আগেই হয়ত তার আক্রমণের নোটিশ পেয়ে সতর্ক হওয়া যায় ; ফুরফুরে চোরা চাল কিন্তু সাংঘাতিক। হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে একটা আলগা কাগজ চাপা না দিয়ে শয্যার উপর রেখে অপর কাজে মন দিয়েছি, এমন সময়ে অলক্ষিতে এক ফুঁ ফুরফুরে হাওয়া ঘরে ঢুকে শয্যা আর সেই কাগজের মধ্যবর্তী অতি-সঙ্কীর্ণ একটু যে স্থান, তথায় প্রবেশ ক'রে এমন একটু উৎসাহের সৃষ্টি করলেন যে, সেই আলগা কাগজখণ্ড অকস্মাৎ এক লম্ফে উঁচু হয়ে উঠে এঁকে-

বেঁকে এ-কাত ও-কাত হতে হতে অনির্দিষ্টের পথে ভেসে চলল। তাড়াতাড়ি কলম রেখে হাঁ-হাঁ ক'রে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম। কিন্তু অতি অল্পর জন্যে হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে পাপিষ্ঠ নিম্নাভিমুখ হয়ে মেঝের উপর প'ড়ে একেবারে শেল্‌ফের তলায় গিয়ে ঢুকল।

আমার সঙ্গে রসিকতা করবার জন্যে এ যে কোনো ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়, এ যে একান্তই বায়ুযোগে কাগজখণ্ডের স্বাভাবিক অনিবার্য আচরণ, তা স্পষ্টই বুঝি। তবু মন হয়ে ওঠে উত্তপ্ত। দেহের উর্ধ্বাংশ নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে মুখ লাল ক'রে শেল্‌ফের তলায় হাত চালিয়ে অতি কষ্টে কাগজটাকে টেনে বার করি। তার পর পলাতক আসামীকে পুনঃপাকড়াও করার পর ক্রুদ্ধ পুলিসের ন্যায় কাগজখানাকে শয্যার উপর রেখে তার উপর একটা মোটা অভিধান দুম্ ক'রে ফেলে দিয়ে মনে মনে আস্ফালন করি, এবার ওড়্! দেখি না, পাখায় তোর কত জোর! জানলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দক্ষিণা বাতাসকে উদ্দেশ ক'রে বলি, আজ্ঞে হোক! একবার ওড়ান!

পরক্ষণে নিজের ছেলেমানুষি দেখে মনে মনে হাসি।

এই আমার ঘর।

একদিন সকালবেলা। চা-পানের পর খাতা-কলম নিয়ে লেখবার অভিপ্রায়ে বসেছি। এমন সময়ে সহসা মাথায় একটা খেয়াল এল। যাঁহা চিন্তা তাঁহা কাজ। তখনি একটা শক্ত কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম "শেষ বৈঠক"। তারপর পীজবোর্ডের উপর সেটা আঠা দিয়ে এঁটে উপর দিকে ফুটো ক'রে সুতো বেঁধে দেওয়ালের এক জায়গায় দিলাম ঝুলিয়ে।

বাড়ির লোক ত দেখে অবাক। এ কি কাণ্ড! সকলেরই চোখে চোখে অসন্তোষের আভাস, কারো কারো বিষাদের ছায়া। এ বোধ করি অদৃষ্টেরই ইঙ্গিত! ভদ্রলোক তা হ'লে শেষ বৈঠকেই হয়ত বসলেন!

বাড়ির মধ্যে যে-মানুষ একমাত্র দুঃখ ও অভাব ভিন্ন আমার আর কোনো বিষয়েরই শেষকে আমল দিতে চান না, তিনি বললেন, ও কি অলক্ষণে কথা! খুলে ফেল এখুনি।

অভয় দিয়ে বললাম, শেষ বললেই শেষ যদি আগিয়ে আসত, তা হ'লে শুরু বললে হিসেবমতো শেষের ত পেছিয়ে যাবার কথা। কিন্তু সে অমোঘ শেষ এমন কঠিন বস্তু যে, শেষ অথবা শুরু ঝুলিয়ে তাকে এ-দিক ও-দিক করবার কোনো উপায় নেই।

মহা উৎসাহে নূতন খাতায় "শেষ বৈঠক" নাম দিয়ে লেখা আরম্ভ ক'রে দিলাম। পাতাখানেক লিখেছি, এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করলে সমীর ভট্টাচার্য—আমার এক তরুণ সাহিত্যিক বন্ধু।

সমীর বোধ হয় বাইরে থেকে তালিম নিয়ে এসেছিল, শেষ বৈঠকের সাইনবোর্ডের উপর অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, না দাদা, এ কি কাণ্ড করেছেন! এর মধ্যে 'শেষ' কথা কেন?

বললাম, এর মধ্যে নয় সমীর, মেঘে মেঘে বেলা অনেক বেড়ে গেছে। এখনো যদি শেষ বৈঠকে না বসি তা হ'লে পাড়ার লোকের ধৈর্য থাকবে কেন? নিন্দে করবে। তিন বছর আগে সত্তর বছরের গান গেয়েছিলাম মনে আছে ত?

সমীর বললে, গেয়েছিলেন মনে আছে, গানটা কিন্তু মনে নেই। আছে না-কি গানটা হাতের কাছে?

বললাম, আছে। ভালই হবে, সেই কবিতাটা দিয়েই শেষ বৈঠকের মঙ্গলাচরণ করি। সেদিনের বৈঠকে সজনী ভায়া উপস্থিত ছিলেন।

সমীর বললে, সে কথা মনে আছে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কবিতাটা 'শনিবারের চিঠি'র জন্যে নিয়ে গেছলেন।

কবিতাটা হাতের কাছেই দেরাজের মধ্যে ছিল। বার ক'রে সমীরকে শোনাতে আরম্ভ করলাম।—

সত্তব হ'ল আজ, সত্বর হও ভাই,
পৌছেছে হরকরা, বেশী আব দেবি নাই।
দণ্ডশিলাঙ্কিত নীল খামে পত্তব
এসেছে ও-পার হতে, হও ভাই সত্বর।
কাটো মায়া-রজ্জু, দৃঢ কর চিত্ত ;
তা ব'লে ভাবিয়ো নাকো জগৎ অনিত্য,
যতদিন আছি হেথা ততদিনই সত্যিই,
ফুবালে চলিয়া যাব ? কি তাহে আপত্তি!
দাবা সুত কন্যা নহে নহে ছায়া হে,
যে দিয়েছে সুখ-দুখ আছে তার কায়া হে।
ছেড়ে যেতে হচ্ছে ? উপায় কি বল ভাই ?
মেয়াদ ফুরাসে পরে কি করিবি ছল ভাই ?
বেসেছিনু ভাল এই সুন্দরী ধরণীরে,
আলোকে আকাশে ভরা উজ্জ্বলবরণীরে।
বেসেছিনু সুদূরেব চন্দ্র ও তাবকায়,
বেসেছিনু মানুষেরে সুগভীর মমতায়।

ছেড়ে-ছুড়ে সব কিছু হাসি মুখে চল্ ভাই,
না হয় আনিয়া চোখের এক ফোঁটা জল ভাই।
দূরে থাক্ অভিযোগ, দূরে থাক্ অভিমান,
কি হইবে খতাইয়া দান আর প্রতিদান ?
জীবনের হাটে-বাটে দেখিয়াছি বার বার
আমার হয় নি শুধু ক্ষতিকর কারবার।
পঙ্কে পড়েছি বটে, পঙ্কজে পেয়েছি,
লভিয়াছি কিছু তার যতখানি চেয়েছি।
খুশী আছি, সুখে আছি, মনে কোনো ক্ষোভ নেই,
না-পাওয়া মালের প্রতি অনুচিত লোভ নেই।
ক্ষমা চেয়ে, ক্ষমা ক'রে, ভালবেসে যাই হে,
যেখানে যে আছ থাক সুখে, তাই চাই হে।
সত্তর হল আজ, সত্বর হই ভাই,
পৌঁছেছে হরকরা, দেরি নাই, দেরি নাই॥

পড়া শেষ ক'রে বললাম, তিন বছর প্রায় হয়ে এল, দেরিও যথেষ্টই হয়েছে। এখনও শেষ বৈঠকে না বসলে লোকে যে গায়ে ঢিল ছুঁড়বে সমীর।

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আমার হাতের কাগজটার প্রতি উঁকি মেরে দৃষ্টিপাত ক'রে সমীর বললে, তলায় তারিখ লেখা রয়েছে যেন দাদা ?

বললাম, হ্যাঁ। ২৬ আশ্বিন ১৩৫৮।

এই সময়ে ভৃত্য এসে আমার হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড দিলে। প'ড়ে বললাম, এইখানেই বাবুকে নিয়ে আয়। কার্ডখানা সমীরের হাতে দিলাম।

কার্ডের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে বিস্মিত-কণ্ঠে সমীর বললে, কি সর্বনাশ! বিষ্ণু নাগ? আপনার সেই মায়ামমতাবর্জিত চক্ষুলজ্জা-হীন কঠোর সমালোকে না-কি?

হ্যাঁ।

ইনি আপনাকে পত্রাঘাতই শুধু করেছেন, না, এর আগে দর্শনও দিয়েছেন কোনদিন?

না, দর্শন আজ এই প্রথম দিচ্ছেন। তুমি আর আমি এক-সঙ্গেই দর্শন পাব।...জমল দেখছি!

ন'ড়ে-চ'ড়ে জুত ক'রে ব'সে উৎফুল্ল মুখে সমীর বললে, দারুণ জমল।

কিন্তু তিন-তিনখানা চিঠির একখানারও জবাব দিই নি, তার কি কৈফিয়ত দেওয়া যায় বল দেখি?

উত্তর দেওয়ার সময় পেলে না সমীর। সিঁড়িতে মানুষ ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। কিন্তু মানুষ উঠছে না ত, যেন ঘোড়া উঠছে! পায়ে অ্যামিউনিশন্ বুট্ লাগিয়েছে না-কি বিষ্ণু নাগ?

## ২

বাইরে দোরের পাশে জুতো খুলে রেখে ঘরে প্রবেশ করলেন শ্রীবিষ্ণু নাগ।

নমস্কার!

মূর্তি দেখে আর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। যা প্রত্যাশা করেছিলাম, তার কাছাকাছি ত নয়ই, বেশ-খানিকটা দূর। মাথায় এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল, নাতিদীর্ঘ অবলিষ্ঠ দেহ, অঙ্গে গলাবন্ধ কোট, পরিধানে মিলের ধুতি। কোটর-প্রবিষ্ট দুই চক্ষু হ'তে নির্গত সার্চ-লাইটের ন্যায় প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি, সর্বদাই যেন খুঁজে বার করবার তালে আছে। বয়স সম্বন্ধে নিশ্চিত ক'রে কিছু বলতে হ'লে কেবলমাত্র বলা চলে, পঞ্চান্নর নিম্নে অথবা পঁচাত্তরের ঊর্ধ্বে নয়। এই বিশ বৎসরের বিস্তৃতির অন্তর্গত যে-কোন একটা সংখ্যা হ'লেই বিশ্বাস করা চলতে পারে।

জুতোটা একটু আড়ালে ছেড়েছিলেন বিষ্ণু নাগ, সুতরাং কি-রকম জুতো দেখতে পাই নি। তবে যেরূপ ত্বরিতবেগে ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন তাতে অ্যামিউনিশন্ বুট্ সম্ভব ব'লে মনে হয় না। বোধ হয় নাগরা-জাতীয় কোনো জুতোয় সম্প্রতি নাল লাগিয়ে থাকবেন, তাই ঘোড়ার চালে সিঁড়ি ভাঙছিলেন।

একটা চেয়ার দেখিয়ে ঈষৎ আত্মীয়তার সুরে বললাম, "নমস্কার! বসুন।"

"বিনা আমন্ত্রণে ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে যখন বাধ্য করেছেন, তখন না বললেও বসতাম। কিন্তু বললেন যখন, ধন্যবাদ দিয়েই বসি।"

ব'লে বিষ্ণু নাগ আমার দেখানো চেয়ারে উপবেশ করলেন। তাঁর ভাষায় এবং ভাবে ঝটিকার ইঙ্গিত। ইঙ্গিত যে তিনখানা চিঠির উত্তর না দেওয়ার বায়ুকোণে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

গলা ভিজিয়ে খানিকটা মন ভেজাবার সদভিসন্ধিতে বললাম, "একটু চা দিক আপনাকে ?"

মাথা নেড়ে, বিষ্ণু নাগ বললেন, "আজ্ঞে না, প্রেসারের গোল আছে।"

"তা হ'লে একটু না-হয় শরবত ?

"আজ্ঞে তা-ও না। শ্লেষ্মার ধাত।"

বাপ রে! ত্রিদোষের মধ্যে দুটির ত সন্ধান পাওয়া গেল, শেষ চিঠিখানার যা ঠোঁট-কাটা ভাষা তাতে পিত্ত-দোষও না থেকে যায় না। দেরাজের ভিতর থেকে সিগারেটের বাক্স আর দেশলাই বার ক'রে শ্রীনাগের দিকে এগিয়ে ধরলাম।

"মাপ করবেন, নেশা করি নে।"

অনিবার্য সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখে সমীর বোধ হয় মনে মনে মালকোঁচা মারছিল। এবার সে-ই কথা কইলে; বললে, "মাপ করবেন, সিগারেট নেশার জিনিস নয়।"

সমীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিষ্ণু নাগ বললেন, "মাপ করবেন, যে জিনিস না খেলে দেহের চলে কিন্তু মনের চলে না, তাই নেশার জিনিস। গাঁজাকে নেশার জিনিস বলবেন ?"

সমীর বললে, "বলব।"

"ভাঙকে ?"

"তাও বলব।"

"গাঁজা তামাক ভাঙ—তিনই সমান।"

মাথা নেড়ে সমীর বললে, "আজ্ঞে না, নাগ মশায়, মানতে পারলাম না। আপনার ছড়ায় গাঁজা তামাক ভাঙ তিনই সমান, —আমাদের ছড়ায় কিন্তু গাঁজা আফিম ভাঙ তিনই সমান। তামাক খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে প'ড়ে আছে, এমন কখনো শুনেছেন ?"

বিষ্ণু নাগ বললেন, "তা হয়ত শুনি নি, কিন্তু তামাক না খেয়ে বুদ্ধি জমাট মেরে ব'সে আছে তা দেখেছি। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে তামামখোরদের বুদ্ধি খোলে না, তা জানেন ত ? কোনো উপায়ই মাথায় আসছে না,—তখন হয় কল্‌কে সাজতে বোসো, না-হয় দেশলাই জ্বেলে চুরুট ধরাও। এমন জিনিসকে নেশার জিনিস ব'লে বিশেষ অপরাধ করেছি কি ?···কিন্তু একটু অসুবিধে হচ্ছে।"

কৌতূহলী হয়ে সমীর জিজ্ঞাসা করলে, "কি অসুবিধে বলুন ত ?"

"যাঁর সঙ্গে এতক্ষণ আলোচনা চালাচ্ছি, তাঁর নামটি এ পর্যন্ত জানি নে। কিন্তু দেখছি, তিনি অন্ততঃ আমার নামাংশ জানেন।"

সমীরের মুখে নিঃশব্দ হাস্য দেখা দিলে; বললে, "ও, এই আপনার অসুবিধে! কিন্তু আমার মতো সামান্য লোকের নাম না জানলেও আপনার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিষ্ণু নাগ বললেন, "বিলক্ষণ! বরং সামান্য লোকদের নাম না জানলেই অসুবিধে হবার কথা। যাঁরা অসামান্য, নামটাই তাঁদের একমাত্র পরিচয় নয়। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ না ব'লে কবিগুরু বললে সকলেই বুঝবে রবীন্দ্রনাথ; মহাত্মাজী বললে গান্ধীজী। কিন্তু নাগ মশায়কে শুধু নাগ মশায় বললেই সবটা বুঝবে না; বিষ্ণু নাগ বললে তবে হয়ত খানিকটা বুঝতে পারবে।"

যা হোক, বিনয়ও কিছু আছে! সামান্য লোকের নামের অপরিহার্যতার প্রসঙ্গে যে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওঠবার উপক্রম করছিল, সামান্য লোকের দৃষ্টান্তে নিজের নাম প্রয়োগ করায় তা খানিকটা শীতল হয়ে গেল। বললাম, "এঁর নাম সমীর ভট্টাচার্য। ইনি একজন শক্তিমান লেখক আর কবি।"

বিষ্ণু নাগ বললেন, "এই দেখুন ত কত সুবিধে হল! আপনি শশধর কারফরমাও হতে পারেন এখন কথা মনে করবার আর কোনো কারণ রইল না। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ থেকে কোনো একটি পদার্থকে বিশেষ ক'রে নির্দেশ করবার একটা উপায় হ'ল তার একটা নাম দেওয়া। ঐ যে সামনের কোণে একটি সামান্য জলপাত্র রয়েছে, ওর নাম দেওয়া হয়েছে কুঁজো; আর একতলায় উপেনবাবুর একটি যে কুকুর আছে, তার নাম শুনলাম লালী। বাড়িতে ঐ একটিমাত্র কুকুর, কিন্তু তবুও তাকে 'কুকুর' ব'লে ডাকবার কথা কারও মনে উদয় হয় নি।"

তারপর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "আপনার লালী আমাকে দেখে এমন চিৎকার ক'রে তেড়ে এসেছিল যে ভাবলাম, কামড়াল বুঝি!"

বললাম, "না, লালী কামড়ায় না। জানেন ত, A barking dog seldom bites!"

বিষ্ণু নাগ বলেন, "তা ত ছেবেবেলা থেকেই জানি। কিন্তু এ কথাও জানি, মাঝে মাঝে না কামড়ালে seldom শব্দটার কোনো সার্থকতা থাকে না।"

এই কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যে সমীর আর আমি দুজনেই হেসে উঠলাম।

বিষ্ণু নাগ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, লালী কোন্ জাতের ?"

বললাম, "কুকুর জাতের। তার বেশী আমি আর কিছুই বলতে পারি নে। তবে চোখ-না-ফোটা অবস্থায় একজন মেমসাহেবের কাছ থেকে যখন পাওয়া গিয়েছিল তখন আর্যজাতীয় ব'লেই মনে হয়। ওর চোখ-মুখ হাত-পা গড়ন-লোম সবই অভিজাত্যপ্রকাশক, শুধু খাড়া কান দুটো বোধ হয় অনার্য-পিতৃত্ব জ্ঞাপন করে। ওর পাছা এমন সমতল যে, প্রয়োজন হ'লে যতক্ষণ-আবশ্যক হনুমানের মতো খাড়া হয়ে ব'সে থাকতে পারে। কেউ যদি টেবিলে ব'সে মাংস খেলে, লালী তা হ'লে তার সম্মুখে মেজের উপর ক্যাঙ্গারুর মতো সোজা হয়ে ব'সে একেবারে শিথিলহস্ত ঊর্ধ্বমুখ উমেদার।"

ঈষৎ পুলকিত হয়ে বিষ্ণু নাগ বললেন, "ভারি চমৎকার ত! শুনলাম নতুন কোনো লোক এলে ওর হিসেবে সুজন-দুর্জন বিচারের ওর একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। যদি মনে করলে নবাগত সৎলোক, তার দ্বারা অনিষ্ট হবার বিশেষ কোনো আশঙ্কা নেই, তা হ'লে খুব খানিকটা ঘেউ ঘেউ ক'রে এগিয়ে গিয়ে তারপর নিঃশব্দে তার কাপড় শুঁকতে আরম্ভ করবে, আর, যদি নবাগতের নিরীহতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে না পারে, তা হ'লে নবাগতের এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পেছিয়ে পেছিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনার বৈঠকখানার ফরাসের তক্তা-পোশের তলায় ঢুকে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকবে।"

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাকে দেখে কি করেছিল ?"

বিষ্ণু নাগ কোনো উত্তর দেবার পূর্বে গম্ভীরভাবে সমীর উত্তর দিলে, "বোধ হয় তক্তাপোশের তলায় ঢুকেছিল।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বিষ্ণু নাগ বললেন, "আমি যে দুর্জন নই, সে বিষয়ে সমীরবাবু আশ্বস্ত হতে পারছেন না।…কিন্তু ওঁর অনুমান ভুল হয় নি,—সত্যিই লালী তক্তোপোশের তলায় ঢুকেছিল।"

সমীরের মন্তব্যের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুলটুকু ছিল, যা বুঝতে বিষ্ণু নাগের বিলম্ব হয় নি, তার জ্বালা একটু প্রশমিত করবার উদ্দেশ্যে বললাম, "জীব-জন্তু পশু-পক্ষীরা কি দেখে আর কাকে দেখে যে তক্তাপোশের তলায় ঢোকে, অর্থাৎ ভয় পায়, তা নির্ণয় করা সব সময়ে সহজ নয়। আমার পাঁচ বছরের পৌত্রী মন্দিরার প্রতি লালীর ভালবাসাব অন্ত নেই। মন্দিরাকে দেখলেই সে তার পিছনে পিছনে ছুটবে। মন্দিরার সব রকম দৌরাত্ম্য অকাতরে সহ্য করবে; কিন্তু আমাব এক বছরের পৌত্র সুবুকে দূরে আসতে দেখলেই সে তাব সকল আবাম আব আলস্য ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে তক্তাপোশের তলায় গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমার বিশ্বাস, উৎসাহের অভাবে তার ন্যাজটাও নীচুর দিকে বেঁকে থাকে। সুবু দেখতে মানুষের মতই, অথচ বে-আন্দাজভাবে ছোট, আশ্বস্ত হবার মতো লালী তার মধ্যে ঠিক হিসেব পায় না; কি জানি কি করতে কি করবে, হয়ত বা চোখে একটা আঙুল ঢুকিয়েই বসবে! তার চেয়ে তক্তাপোশের তলাই নিরাপদ।…আমাদের দোতলার বারান্দায় একটা টিয়া-পাখী আছে। তার নাম ফুলী। ফুলীর খাঁচা সুবুর হাতের নাগালের অনেক ওপরে ঝোলে। কিন্তু তবুও তার বিশ্বাস নেই, সুবু তার খাঁচার তলায় এসে দাঁড়ালে ঠিক সেই-ভাবে চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে চিৎকার করতে থাকে যেমন তার করা উচিত একটা হুলো-বেড়াল এসে দাঁড়ালে। এখানেও হয়ত তার লালীর মতো একই উদ্বেগ,—যারা তাকে ছোলা দেয়, জল দেয়, যারা তাকে

স্নান করায়, তাদের মতোই দেখতে অথচ সাংঘাতিকভাবে ছোট, কি জানি হাত বাড়িয়ে ন্যাজ ধ'রে টানই যদি দেয়! তার চেয়ে চিৎকার ক'রে লোক জড়ো করা ভাল।"

অসাব দীর্ঘ বচন শুনে হয়ত তাব মধ্যে সমীরের আক্রমণের কিছু কাটান বুঝতে পেরে বিষ্ণু নাগ বললেন, "ধন্যবাদ। কথা ত অনেক হ'ল, এবার একটু কাজের কথা হোক।"

কাজের কথা যে কি কথা তা বুঝতে বাকি রইল না। মনে করছিলাম, হয়ত খানিকটা ভুলিয়েছি, কিন্তু পাঁড় ভাবিকে ভোলানো আমার কর্ম নয়। উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে কথা কইলে সমীব; বললে, "এতক্ষণ যে কথাগুলো হ'ল সেগুলো কি আপনি বাজে কথা মনে কবেন নাগ মশায়? আমার ত মনে হয় একটা সরস বৈঠকের পক্ষে এ কথাগুলো ঠিক সেইভাবে ফাঁকা, পৃথিবীর পক্ষে যেমন ফাঁকা আকাশ।"

বিষ্ণু নাগের মুখে একটা চাপা-হাসি দেখা দিলে; বললেন, "ফাঁকার মহিমা কিছুই বুঝি নে—এতটা নিরেট আমি নই সমীরবাবু। ফাঁকা সব সময়ে ফাঁকি নয় তা আমি জানি। তবু তেল কিনতে মুদীর দোকানে গিয়ে রামায়ণপাঠ যদি শুনি, তেল কেনাটাকেই আসল কাজ বলব।"

যে বিপদ অনিবার্য, দূর থেকে ভয় না দেখিয়ে তা এসে পড়লেই শ্রেয়। বললাম, "কি আপনার কাজের কথা বলুন?"

"আমার লেখা চিঠিগুলো পেয়েছেন কি?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

"তিনটেই?"

শেষের চিঠিটা ভারি বিকট, আর সেখানা পেয়ে উত্তর

না দিয়ে চুপ ক'রে থাকা সত্যিই অপরাধার্হ—অন্তত সেখানা যদি···

কিন্তু নাঃ। যে-রকম চক্ষুলজ্জাহীন আর কঠিন লোক বিষ্ণু নাগ, ডাক-বিভাগের কার্য-প্রণালীর বিরুদ্ধে অনুযোগের দ্বারা অপরাধ-লাঘবের চেষ্টা শুধু নিরর্থক হবে না, হয়ত গ্লানিকরও হবে। বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনটেই পেয়েছি।"

"তবু একটারও উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলেন না?—শেষেরটারও না?"

ব্যগ্র-কণ্ঠে বললাম, "না, না, শুধু শেষেরটারই বা কেন, সব-গুলোরই উত্তর দেওয়া দরকার মনে করেছিলাম। তবে ভাগ্য-দোষে অনেক-কিছুই যেমন পাই নি, চিঠি পেয়ে যথাসময়ে উত্তর দেবার অভ্যেসটাও তেমনি।"

আমাকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে বিষ্ণু নাগ বললেন, "অভ্যেস কেন বলছেন? বদ্ অভ্যেস বলুন। বলুন, ভাগ্যক্রমে অনেক জিনিস যেমন পেয়েছি, চিঠি পেয়ে উত্তর না দেবার বদ্ অভ্যেসটাও তেমনি পেয়েছি।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম; বললাম, "ঠিক বলেছেন, বদ্ অভ্যেসই বটে। অপগুণটা জমার ঘরেই ফেলতে হবে।"

ওদিকে ইতিমধ্যে সমীর একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিষ্ণু নাগের প্রতি কুঞ্চিত চক্ষুর দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "চিঠির উত্তর চট্‌পট্ পেলে খুশী হন বিষ্ণুবাবু?

"আপনি হন না?"

"আমার কথা পরে বলব। আপনি হন?"

"হই।"

"তা হ'লে এবার থেকে বীমা-কোম্পানির এজেণ্টদের আর ভেজাল ওষুধের কারবারীদের চিঠি লিখবেন খুব তাড়াতাড়ি উত্তর পাবেন।"

কুঞ্চিত চক্ষে বিষ্ণু নাগ বললেন, "আর ভেজাল সাহিত্যের কারবারীদের লিখলে ?—উত্তর পাবই না ?"

"দাদা, আপনার শেষ বৈঠক অক্ষয় হোক। আজ উঠলাম,—আর একদিন আসব।" ব'লে সমীর আসনত্যাগের উপক্রম করলে।

তার পাঞ্জাবির হাতাটা চেপে ধ'রে বললাম, "আরে, ব'স, ব'স, অত অধীর হ'লে কি চলে ? এই ত সবে রস জমতে আরম্ভ করেছে।"

ঠিক এই সময়ে নিচে লালী চিৎকার ক'রে উঠে ক্ষণকাল পরেই নিঃশব্দ হয়ে গেল।

আমি বললাম, "কারুর আসার সংবাদ লালী ঘোষণা করলে।"

বিষ্ণু নাগ বললেন, "এত শিগগির যখন চুপ ক'রে গেল তখন কোনো সজ্জনই হবেন। এতক্ষণ হয়ত লালী তাঁর কাপড় শুঁকছে।"

সমীর কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পড়ল। আমার পৌত্রী মন্দিরা দ্বারদেশে এসে বললে, "দাদু, রাণী রায় এসেছেন।"

"রাণী এসেছে ? কই, সে কোথায় ?

"নীচে ঠামুর সঙ্গে কথা কচ্ছেন।"

উৎফুল্ল হলাম। অনেক দিন রাণী আসে নি। কি জানি হয়ত অসুখ-বিসুখ করেছিল। ভারি ভাল মেয়ে।

সিঁড়ির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মন্দিরা বললে, "ঐ আসছেন।"

৩

আজ বৈঠকে আমি একা।

যারা আমার বৈঠকে আজ প্রবেশ করে নি, আমার প্রতি একান্ত মমতা বশতই তা করে নি। আমার মনের মধ্যে যে বিপর্যয় সহসা দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে একটা সম্ভবমতো হিসেব-নিকেশ করবার সুযোগদানের জন্যে তারা আমাকে আমার নিঃসঙ্গতার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। এই সহৃদয়তার জন্যে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সকাল থেকে বাইরের আকাশে মেঘ-বৃষ্টির খেলা চলেছে। আমার অন্তরের আকাশেও সেই একই ধরনের খেলা। আজ সকালে আমার পুত্রাধিক স্নেহাস্পদের বিগতপ্রাণ দেহ দেখে এসেছি। পিঞ্জর প'ড়ে আছে, পাখী উড়ে গেছে সাগরের পারে। কিন্তু কোন সুদূরের তীরে, কোন্ আশ্রয়-শাখার নীড়ে, তা জানা নেই। এই অজানার মহারিক্ততাই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা সুপরিচিত এবং ভুঞ্জিত আমাদের ঐশ্বর্যময় ইহলোকের পটভূমি। এই পটভূমির রহস্যময়তাই আমাদের ইহজীবনকে একই সঙ্গে চেতনায় আলোকিত এবং সংশয়ে ম্লান করে।

গতাসুর চতুর্দিকে শোকাতুর আত্মীয়-স্বজনের মুখে মুখে বিয়োগ-ব্যথার সহিত মিশ্রিত একটা সন্ত্রাসের ছাপ। কি ভয়ানক! জীবন তা হ'লে এতই অকস্মাচ্ছেদনীয় ব্যাপার যে, পরলোকের মাত্র পনের মিনিটের নোটিসকেই নির্বিবাদে মেনে নিতে হ'ল! অক্সিজেন-সিলিণ্ডার আর ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে দু-চার ঘণ্টাও অতিশীর্ণ নোটিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা গেল না!

এই একান্ত নিরুপায়তার ত্রাসে সকলের মুখে অশান্তির কালিমা। কিন্তু এই অশান্তির কালিমার যিনি হেতু, তাঁর মুখে অনাবিল প্রশান্তি ; যেন স্বপ্নহীন সুষুপ্তির মধ্যে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ্ন সে মুখ।

অথচ স্বল্পকাল পূর্বেও চিন্তা ও উদ্বেগ থাকবার যথেষ্ট কারণই ছিল। সার্থক কর্মময় জীবনের বিস্তৃত কারবার শাখায় শাখায় বিভক্ত। কোনো শাখা অবতরণ করেছে গভীর খাদে, কোনো শাখা আরোহণ করেছে উচ্চ উপত্যকায়, কোনো শাখা সক্রিয় হয়েছে দামোদরের জলোচ্ছ্বাসের ধারে, কোনো শাখা সঞ্চারিত হয়েছে নগরে নগরে রাজপথ-পার্শ্বের অট্টালিকায় হর্ম্যে। এই বিরাট কর্মসংস্থার মুনাফা-প্রসবজনিত উৎসাহ ও উদ্দীপনা যেমন প্রচুর, মুনাফা-প্রসব যাতে বজায় থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে তার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও কম নয়। আজ বিগত-প্রাণের মুখমণ্ডলের প্রশান্তি দেখে মনে হচ্ছে, মৃত্যু যেন এই সমুদয় উৎসাহ উদ্দীপনা উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা এক মুহূর্তে হরণ করেছে।

মৃত্যু যদি জীবনের নিরবশেষ বিরতি হয়, তা হ'লে ত হরণ করা না-করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তা যদি না হয়? মৃত্যুর পরও যদি কোনো দেহাতীত—তা সে যত সূক্ষ্ম যত দুর্দর্শই হোক, অবশেষ থাকে—তা হ'লে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সকলেরই মনে অল্পবিস্তর এই মৃত্যু-জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়ঃ মৃত্যুর পরে কিছু আছে, অথবা নেই?

যমের নিকট নচিকেতা তাঁর তৃতীয় বরে এই কথাই জানতে চেয়েছিলেন।

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেব বরস্তৃতীয়ঃ॥

—কোনো লোক বলে, মৃত্যুর পরে আছে ; কোনো লোক বলে, নেই। এই বিচিকিৎসা এই সংশয় যাতে দূরীভূত হয়, তৃতীয় বরে আমাকে সেই বিদ্যা দান কর।

প্রথম দুটি বর যম নির্বিবাদে নচিকেতাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বরটি দিতে তিনি সহজে সম্মত হন নি ; বলেছিলেন, এ বড় শক্ত কথা। পূর্বে দেবতাদেরও এ বিষয়ে সংশয় ছিল। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর,—অন্যং বরং বৃণীষ্ব।

অন্য বরের দ্বারা যম নচিকেতাকে সকল পার্থিব সম্পদ দেবার লোভ দেখালেন। ইহলোকে যত-কিছু কামনার বস্তু আছে সমস্ত দিতে প্রতিশ্রুত হলেন,—পুত্রপৌত্র, পশু, হস্তি-হিরণ্য-অশ্ব, মহদায়তন ভূমি, দিব্যা রমণী, বিপুল রাজত্ব—কিছুই বাদ দিলেন না, এমন কি এই বিনাশশীল ইহলোকে সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু ইচ্ছামৃত্যু, যা অমরত্বের চেয়েও এক হিসাবে মূল্যবান সম্পদ, তাও দিতে চাইলেন,—স্বয়ং চ জীব যাবদিচ্ছসি,—যতদিন ইচ্ছা জীবন ধারণ কর।

কিন্তু এ সকল পার্থিব সম্পদে নচিকেতা প্রলুব্ধ হলেন না। মাথা নেড়ে তিনি বললেন, আমি এ সকলের কিছুই চাই নে। মৃত্যুর পরের যে সংশয় (বিচিকিৎসা) তৎসম্পর্কে মহৎ জ্ঞানের কথা আমাকে বল।

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।

নচিকেতার অলৌকিক নির্লোভতা এবং চিত্তশুদ্ধি দেখে যম অবশেষে তাঁর প্রার্থিত তৃতীয় বর তাঁকে দান করলেন। যম বললেন, মৃত্যুর পরও অস্তিত্ব আছে ; মৃত্যুর পর যে বস্তু থাকে তার নাম আত্মা ; এই আত্মা বারম্বার পুরাতন দেহ ত্যাগ এবং নূতন দেহ গ্রহণের দ্বারা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যাতায়াত করে ; এই অবিরাম যাতায়াতের দুর্ভোগ হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে একমাত্র ব্রহ্মোপলব্ধি ভিন্ন উপায়ান্তর নেই।

এই ব্রহ্মোপলব্ধি কিন্তু সহজলভ্য বস্তু নয়। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"—তর্কের দ্বারা তা পাওয়া যায় না ; "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'—এই আত্মা প্রবচনের দ্বারা, বুদ্ধি ও শ্রবণের দ্বারা পাওয়া যায় না। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"—বাক্য মন অথবা চক্ষুদ্বারা পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু অবিচল অধ্যাত্মযোগের সাধনায়, যদ্দ্বারা হর্ষশোক অতিক্রম করা যায়।

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

নচিকেতার অধ্যাত্ম সমৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হয়ে যম তাঁকে অধ্যাত্ম-যোগের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কি সহজ পথ? মায়া-মোহ-বাসনা-কামনা-শৃঙ্খলিত সাধারণ মানুষের পক্ষে সে পথের পথিক হওয়া কি সহজ কথা? সুদীর্ঘকালব্যাপী অধ্যাত্ম-সাধনার শেষে রবীন্দ্রনাথের নিকটও মৃত্যুর পরবর্তী ব্যাপার 'মহা অজানা'ই

থেকে গিয়েছিল। মৃত্যুর যবনিকা যদি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হ'ত তা হ'লে কখনই তিনি বলতেন না—

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।

অস্ত-রবির এই গানটিতেও আমরা মানবাত্মা এবং লোকান্তরের পরোক্ষ স্বীকৃতি দেখিতে পাই। বিরাট বিশ্ব যাকে বাহু মেলে গ্রহণ করবে, তা দেহ নিশ্চয়ই নয়, পরন্তু দেহাতীত আত্মা; আর আত্মা যে মহা-অজানার নির্ভয় পরিচয় পাবে তা নিশ্চয়ই ইহলোকের পরিচয় নয়।

এ গানটিতে আত্মার গতি ও গন্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার একটু বিশেষত্ব আছে। আত্মার এই গতির বিরাম নেই, সুতরাং গন্তব্যের কোনো কথাই ওঠে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভূত হয়ে গিয়ে নির্বাণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়, যখন 'চির যাত্রা'র পথে 'তুমি হবে চিরসাথী', আর 'অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার'?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন—

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

—যে জন্মেছে তার মৃত্যু ধ্রুব। আর যে মারা গিয়েছে তার জন্মও ধ্রুব। অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়।

আত্মার অস্তিত্ব এবং পরজন্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি যদি

নির্ভুল ব'লে ধরা যায়, তা হ'লে উপমার ভাষায় বলা যেতে পারে, জীবন-রেলপথে মৃত্যু যেন একটা বড় জংশন যেখানে গাড়ি বদল ক'রে অন্য গাড়িতে চড়তে হয়।

যারা চিন্তাশীল ব্যক্তি, যাদের চিত্তে অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত হবার পক্ষে সহজ ব্যবস্থা বর্তমান, তীক্ষ্ণ মননশীলতার দ্বারা যারা অনুমানকে প্রমাণের স্তরে নিয়ে গিয়ে আশ্বস্ত হতে সক্ষম, তারা না হয় মৃত্যুকে জংশন-স্টেশন মনে করে মৃত্যু-শোক উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, যারা চাকরি করে, পাটের দালালি করে; যারা কারবার চালায়, অধ্যাপনা করে; প্রিয়জনের গতপ্রাণ দেহ শ্মশানে দাহ ক'রে চিতাভস্ম ধুয়ে-মুছে নদীর জলে ভাগিয়ে দিয়ে সব-হারানোর দুঃসহ বেদনা নিয়ে যারা ঘরে ফেরে; যারা 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'-র চেতনায় সন্ত্রস্ত অথচ 'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'-র আশ্বাস-বাণীতে সন্দিহান, মৃত্যুশোক অতিক্রমণ কববার উপায় তাদের পক্ষে কি হতে পারে?

আমার মনে হয়, আমাদের মতো সেই সাধারণ মানুষেব পক্ষে মৃত্যুশোক অতিক্রম করবার দুটি মাত্র উপায় আছে। প্রথমত, ব্যাধি-জ্বরা-মৃত্যুক্লিষ্ট সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়া। যা হাজারের মধ্যে একজনের পক্ষেও সম্ভব নয়, এবং হয়তো হাজারের মধ্যে হাজার জনের পক্ষেই উচিত নয়। আর দ্বিতীয়, এই পৃথিবীর মানব-জীবন একান্ত অলীক ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু, এবং মৃত্যু জীবনের মহা-বিরতিছেদ যার অপর পারে আত্মা অথবা জন্মান্তরের কোনো অস্তিত্ব নেই, মীমাংসার খাতিরে এই অবস্থা স্বীকার ক'রে নিয়ে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা জীবনকে দেখা এবং আচরিত করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এইরূপ,—এই অলীক সংসারে জন্মগ্রহণ না

করতে পারলেই ছিল ভাল, কিন্তু দৈবক্রমে সে অপকর্ম যখন ক'রে ফেলাই গেছে তখন make the best of a bad bargain। আমার হাতের কাছে যে-সব কর্তব্য একান্তভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে, তার মধ্যে জীবনকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ক'রে ধীর-নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্তে উপনীত হওয়া। তার পরও যদি আত্মা এবং জীবন থাকে ত বহুৎ আচ্ছা। আমার গণনা নিবদ্ধ থাকুক শুধু জন্ম ও মৃত্যু দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী আমার চেতনায় উপলব্ধ আমার নিজস্ব এলাকার মধ্যে।

এই চিন্তাপদ্ধতির কিছু সমর্থন পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি শ্লোকে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥

—যদি মনে কর, দেহের সহিত আত্মা নিয়ত জন্মগ্রহণ করেন, আর নিয়ত মারা যান সে অবস্থায় ত, হে মহাবাহো, তোমার শোক করা উচিতই হয় না।

বস্তুত, সাধারণ মানুষের পক্ষে মৃত্যু-শোক অতিক্রম করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে কর্তব্য-সাধনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করা।

ঘরে আলোকের যেন অতি মৃদু একটা পরিবর্তন অনুভূত হল। দোরের দিকে চেয়ে দেখি, নগ্ন নিঃশব্দ-পদে বিষ্ণু নাগ প্রবেশ করছে। চোখে তার করুণার আর্দ্রতা।

আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই গতি সম্বৃত ক'রে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটালাম কি?"

শয্যায় সোজা হয়ে উঠে ব'সে বললাম, "না না, বিঘ্ন ঘটাও নি। এস।"

নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে দুঃখার্ত স্বরে বিষ্ণু নাগ বললে, "উপায় নেই ভাই। সুতরাং—"

সহসা বিষ্ণু নাগ থেমে গেল।

বললাম, "সুতরাং কি করব বল? Eat, drink and be merry—তাই করব? না, 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' করব?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "ও দুটো একই পথের দুই শাখা। যেটাই ধরবে, আসল পথে পড়বে।"

প্রসঙ্গের পরিবর্তন করলাম; বললাম, "আজ তোমার সঙ্গে লালীর কি রকম আচরণ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিষ্ণু নাগ বললে, "আজ আশ্চর্য আচরণ! ডাকে নি ত একবারও, প্রথম থেকেই আমার কাপড় শুঁকেছে। অথচ এর আগে প্রতিদিনই ঘেউ ঘেউ ক'রে আমার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।"

বললাম, "আজ ও বুঝতে পেরেছে আমার জন্যে তুমি সমবেদনা নিয়ে এসেছ। ওরা অনেক-কিছু আমাদের চেয়ে অনেক সহজে বোঝে।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "তা হয়ত বোঝে; কিন্তু খানিকটা বোঝে, সবটা বোঝে না। তা যদি বুঝত, তা হ'লে অন্যদিনও অতটা প্রতিবাদ করত না।"

"সেটুকু লালীর মনিব বোঝে ভাই বিষ্ণু। আমি বুঝি তোমার কাঁটাও আছে, মধুও আছে। আজ মধু ক্ষরণ করতে এসেছ, আবার কোনদিন আসবে কাঁটার আঘাত দিতে।"

"এ তুমি বোঝ ?"

"নিশ্চয় বুঝি। আঘাত দেবার তোমার এতটা তীব্রতার কোনো সদর্থই থাকে না যদি-না তার পিছনে ভালবাসার পৃষ্ঠপোষকতা থাকে।"

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে বিষ্ণু নাগ বললে, "কিন্তু এ কি! হঠাৎ কোন্ মুহূর্তে আমরা পরস্পরে তুমি সম্বোধন আরম্ভ করেছি ?"

বললাম, "বোধ হয় যে-মুহূর্তে আমরা পরস্পরকে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করবার সাহস খুঁজে পেয়েছি।"

কয়েক দিন বৃষ্টি ও বাযুব একটানা মাতামাতিব পব সদ্য-ধৌত নীল আকাশে সূর্যকবেব অবাধ প্রসন্নতা দেখা দিযেছে। মেঘমুক্ত আকাশেব সংবাদ কাকেব ডাকে অতি প্রত্যুষেই শেষ-পাশ-ফেবাব শয্যা হতে পেয়েছিলাম।

কাকেব ডাকেব বর্ণমালা বুঝি—এমন দাবি অবশ্য কবি নে, কিন্তু ওদেব ত্রিবিধ অর্থেব তিন বকম ডাক বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। প্রথম ডাক হচ্ছে, প্রতিদিন প্রত্যুষে তিমিবাবসানে আনন্দেব ডাক ; দ্বিতীয়, বৰ্ষা-বাদল দিনেব একপ্রকাব আর্দ্র ডাক , আব তৃতীয়, বন্দুক-বোমা-পটকাব শব্দে আর্ত ডাক। এ ছাড়া দুর্লভ দুঃশ্রুতিগম্য চতুর্থ এক ডাকও আছে। এ ডাক আলাপবত বায়স-বায়সীব প্রণয়-কাকলি।

কদাচিৎ অতর্কিতে আড়াল-আবডাল হতে শেযোক্ত ডাক শোনা যায়, তাই এ ডাককে দুঃশ্রুতিগম্য বলেছি। প্রেমালাপেব ব্যাপাবে গোপনবাত্রিব বাযসজাতি বিস্ময়জনক মাত্রায নির্জনতা-প্রিয় ব'লে তাদেব প্রণয-কূজন আমবা সাধাবণত শুনতে পাই নে।

এ কথাব প্রতিবাদে কেউ হয়ত বলতে পাবেন, শুনতে না পাওয়াব প্রধান কাবণ, কর্কশভাষী কাক কাকলি অথবা কূজন কিছুই কবে না, কাবণ ও দুটি ব্যাপাব সে কবতেই পাবে না। কিন্তু দ্রবীভূত করাব উত্তাপ প্রণয়েব এত বেশী যে, প্রণয়াপ্লুত কাকেব কর্কশ কণ্ঠস্বব দ্রবীভূত হয়ে কাকলিতে পবিণত হওয়াব দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দেখা যায়।

"দাদা!"

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, অনিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসছে। খুশী হয়ে বলি, "একেবারে ওপরে চ'লে এস।"

অনিল অর্থে আমার সেই তরুণ সাহিত্যিক বন্ধু ইতিপূর্বে সমীর ভট্টাচার্যের বেনামীতে যার পরিচয় পাঠকবর্গকে দিয়েছি।

প্রথমে কল্পনা ছিল, আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যাঁরা শেষ বৈঠকে আবির্ভূত হবেন, আসল নামের পরিবর্তে তাঁদের পরিচয় দেব ছদ্মনামে, হয় অভিন্ন অর্থের শব্দের ব্যবহারে, নয় নিকটতম ধ্বনির শব্দের সাহায্যে। অভিন্ন অর্থের শব্দ, যথা—অনিল, সমীর ; নিকটতম ধ্বনির শব্দ, যথা—কামিনীকুমার, যামিনীকুমার। কিন্তু পরে বিবেচনা ক'রে দেখলাম, তাতে শেষ বৈঠক সাক্ষাৎ ব্যক্তিত্বের সজীবতা হারাবে। একটি ফুটকির খোঁচার বাণীকে তার কমলাসন থেকে সরিয়ে রাজসিংহাসনে বসানো যায় বটে, কিন্তু তার দ্বারা এক পক্ষে কমলাসনাকে হারাতে হয়, অপর পক্ষে সিংহাসনের অধিদেবতাকে পাওয়া যায় না। রামকে শ্যাম বানালে ধনুক আর বাঁশি উভয় হতেই বঞ্চিত হতে হয়।

বন্ধু-বান্ধব দু-একজন আমাকে স্পষ্টত অনুরোধ করেছেন, তাঁদের যদি শেষ বৈঠকের খাতায় নামাই, আসল নামেই যেন নামাই,—ছদ্মনামে নয়। অনিলও জানিয়েছে আসল নামে তার আপত্তি নেই, ছদ্মনামে সে খুব খুশী নয়। তাই স্থির করেছি, এর পর শেষ বৈঠকের পৃষ্ঠায় যাকে নামাব, আসল নামেই নামাব। তা ছাড়া, ছদ্মনামের চোরা বৈঠকের চেয়ে আসল নামের খোলা বৈঠকের একটা সুবিধে এই যে, চোরা বৈঠকের মতো খোলা বৈঠকে কিল খেয়ে কিল চুরি করার শাস্তি ভোগ করতে হয় না। যদি আমি

সমীর ভট্টাচার্যের নামে কোনো আপত্তিজনক মন্তব্য করি, তা হ'লে কিল খেয়ে কিল চুরি করার বেকায়দায় অনিল ভট্টাচার্যকে খানিকটা পড়তেই হয়। চোরের মার কান্নার উপায় নেই। কিন্তু সাক্ষাৎ অনিল ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে সেরূপ মন্তব্য করলে অনিল ভট্টাচার্যের আত্মসমর্থনের পথ খোলা থাকে। ছদ্মনাম নিজে নিলে আত্মরক্ষার দুর্গ হয়; অপরে দিলে বিপন্ন হবার কারণ ঘটে।

ঘরে প্রবেশ ক'রে অনিল জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছেন দাদা? ভাল ত?"

বললাম, "ভাল কেমন ক'রে বলি বল?"

চিন্তিত মুখে অনিল জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, বলুন ত?"

"এ বিষয়ে কবিব উক্তি জান?"

এ কথায় আসল কথাটা রহস্যব্যঞ্জক তা খানিকটা বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হয়ে হাসিমুখে অনিল বললে, "না।"

বললাম, "লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্তাং শরীরে কুশলং তব?
কুতঃ কুশলমস্মাকম্ আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥

—লোক সদ্বার্তা জিজ্ঞাসা করে, তোমার শরীরের কুশল ত? কিন্তু আমাদের কুশল আবার কোথায়, যখন দিন দিন আয়ু যাচ্ছে। এ হল কবির কথা; আমার কথা, যখন আছি তখন ভালই আছি। আমাদের এ বয়সে থাকার অর্থ ই ভাল থাকা।"

অনিল বললে, "এরই মধ্যে বয়সের কথা কেন দাদা? আপনি ত বয়সকে স্বীকার করেন না।"

"সেটা মনের বয়স সম্বন্ধে করি নে। বিপদ কি হয়েছে জান? মনটা এক জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ দেহের বয়স

প্রতিদিন একদিন ক'রে বেড়ে চলেছে। এর ফলে মাঝে মাঝে দেহে আর মনে হোঁচট-খাওয়াখাওয়ি দেখা যাচ্ছে।"

অনিল বললে, "কিন্তু হোঁচট খেতে আপনাকে ত দেখা যায় না দাদা।"

"বাইরের হোঁচট হ'লে দেখতে পেতে। এ অন্তরের হোঁচট—অন্তরেই খাই, অন্তরেই সামলাই।"

এক মুহূর্ত চিন্তিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে থেকে অনিল বললে, "এ সুর ত আপনার নিজের সুর নয় দাদা!"

বললাম, "ভয় পেয়ো না,—এ দরবারি-কানাড়ার স্থায়ী রেখাপাত-করা সুর নয়। এ ক্ষণিকেরই সুর, ক্ষণিকেই স্তব্ধ হয়ে যাবে।···একটু আগে এক শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি এসেছিলেন। কথাবার্তার মধ্যে থেকে থেকে তিনি বলছিলেন, বয়স হয়েছে, বেশী ঘুরবেন না, বিশ্রাম নিন।"

"তাই থেকেই কি এই ক্ষণিক সুরের উৎপত্তি?"

"ক্ষেপেছ? একটি উৎকৃষ্ট উপমা দিয়ে শুভানুধ্যায়ীকে ঠাণ্ডা করলাম। বললাম, লাট্টু যতক্ষণ ঘোরে ততক্ষণই খাড়া থাকে, ঘোরা শেষ হ'লেই প'ড়ে যায়। দীর্ঘ লেত্তির জোর টান দিয়ে বিধাতা আমার মনের লাট্টুকে যে ঘোরণে ঘুরিয়েছেন, তাকে জোর ক'রে থামালে শুভ হবে না।"

নীচে একতলায় লালী ডেকে উঠল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা। বললাম, "খুব সম্ভবত বিষ্ণু নাগ এসেছে অনিল, চিঠি লিখে সাড়ে আটটায় আসবার কথা স্থির করেছিল।"

উৎফুল্ল মুখে অনিল বললে, "এসেছেন? ভাল হয়েছে।

আপনার সঙ্গে সেদিনের কথোপকথনের বিবরণ শুনে ভদ্রলোকের ওপর আমার ধারণা বেশ খানিকটা বদলেছে। মুখটা কঠিন, কিন্তু মনটা তরল।"

বললাম, "কঠিন বস্তুর আবরণে তরল বস্তুর এমন দৃষ্টান্ত আমাদের জগতে কিছু আছে অনিল।"

অনিল বললে, "আপাতত নারকেলের কথা মনে পড়ছে।"

দুপদাপ ক'রে উৎসাহের সহিত সিঁড়ি ভাঙার শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম, ছিতন ঝা আসছে। ছিতন ঝা সম্ভবতঃ শ্রীতনু ঝার অপভ্রংশ।

ছিতন ঝা ঘরে প্রবেশ ক'রে বললে, "বিষুণ নাগ বাবু আয়ে হৈঁ।"

বললাম, "ঠিক হ্যায়। বাবুকো এঁহা লে আও।"

সেই রকম দুপদাপ ক'রে ছিতন ঝা সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল।

৫

ক্ষণকাল পরে কক্ষে প্রবেশ ক'রে বিষ্ণু নাগ বললে, "নমস্কার ভায়া, বড় ঘন ঘন আসতে আরম্ভ করেছি।" তারপর অনিলের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বললে, "এই যে, সমীরবাবুও আছেন! বেশ, বেশ।"

বললাম, "ওঁকে আর সমীরবাবু ব'লে ডাকলে ভুল ডাকা হবে। সমীরবাবু ছিল ওঁর ছদ্মনাম। ওঁর আসল নাম অনিল ভট্টাচার্য।"

"অর্থাৎ?"

কথাটা বিষ্ণু নাগকে বুঝিয়ে বললাম।

শুনে সে মাথা নাড়লে। বললে, "সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে। খোদ বৈঠকে অবশ্য আসল নাম চলবে, কিন্তু বৈঠকের খাতায় ছদ্মনামই ভাল। আবরণের একটা সম্ভ্রম আছে। আসল নামের নিরাবরণতার মধ্যে রহস্যের মাধুর্য নেই। চেনার চেয়ে চিনি-চিনি করা সরস বস্তু।"

অনিল উত্তর দিলে, "কয়েকদিন আগে অমিয়বাবুও এই ধরনের কথা বলছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি নি।"

সকৌতূহলে বিষ্ণু নাগ জিজ্ঞাসা করলে, "অমিয়বাবু কে?"

অনিল উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে উত্তর দিলাম আমি। বললাম, "তুমি যখন ছদ্মনামের পক্ষপাতী তখন 'অমিয়বাবু কে?' এ প্রশ্নের উত্তর দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।"

"কেন?"

"তা হ'লে অমিয়বাবু রহস্যময়তার মাধুর্য হারাবেন।"

বিষ্ণু নাগ এবং অনিল উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

অনিল বললে,"প্রকৃত নাম আর প্রকৃত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে অমিয়বাবুর ব্যক্তিত্বের একটা মূল্য আছে। ছদ্মনামের মধ্যে সে ব্যক্তিত্বের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "কিন্তু বৈঠকের মধ্যের উক্তি-প্রত্যুক্তি ভাব-ভঙ্গী চাল-চলন আচার-ব্যবহারের দ্বারা অমিয়বাবুর যে ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হবে, বৈঠকের পক্ষে সেই ব্যক্তিত্বের মূল্যই সব চেয়ে বেশী; আর সেই ব্যক্তিত্বের সাহায্যে ক্রমশ আসল ব্যক্তিটিকে চিনি-চিনি করাও চলবে। ঠিক বুঝছি না, অথচ চিনি-চিনি করছি, সংশয়স্নিগ্ধ এই অবস্থার বিশেষ একটু মজা আছে। ফোটো-শিল্পের একটা বড় কথা জানেন অনিলবাবু?"

অনিল বললে, "কি, বলুন?"

"চেহারার ফোটো তুলতে হ'লে ফোকাসটা প্রথমে সুস্পষ্ট ক'রে নিয়ে তারপর ঈষৎ অস্পষ্ট করতে হয়। তা হ'লে soft effect পাওয়া যায়, ফোটো অযথা hard হয় না। সংশয়স্নিগ্ধ অবস্থা যা বলছিলাম তা ফোটোগ্রাফের এই 'out of focus softness'-এর সঙ্গে তুলনীয়।"

এবার আমি কথা কইলাম। বললাম, "সে কথা মিথ্যে বল নি। রজনীকান্ত না ব'লে একেবারে দম ক'রে আসল নামটি বললে ওই hard focusing-এর অতিস্পষ্টতার দোষ হয়; soft effect-এর মজা পাওয়া যায় না।"

"তুমি তা হ'লে ছদ্মনামের সপক্ষে?"

"বোধ হয়।"

"তা হ'লে এখন থেকে কোন্ নীতি অবলম্বন করবে?"

"সম্ভবত মধ্যনীতি। অর্থাৎ, কতকটা তোমার soft focusing-এর নীতি, আর কতকটা বিপরীত নীতি। হরেন যদি ছদ্মনাম ধারণে রাজী না থাকে, তা হলে হরেনকে হরেনই বলব ; কিন্তু নরেন যদি ছদ্মনামের পক্ষপাতী হয়, তা হ'লে নরেনের নাম দোব বরেন। দু-চারজন আমাকে স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছেন, তাঁদের যদি বৈঠকে নাবাই, ছদ্মনামের মুখোশ পরিয়ে যেন না নাবাই। আবার এমন দু-চারজন আছেন যাঁদের ছদ্মনাম আসল নামের কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। খেয়ালমতো তাঁদের মধ্যে কারো দোব ছদ্মনাম, কারোর আসল নাম। সুতরাং কোন্‌টা ছদ্মনাম আর কোন্‌টা আসল নাম সব সময়ে ঠিক বোঝা যাবে না।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "অর্থাৎ, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ থাকলে বস্তুত যে কবি সাবিত্রীপ্রসন্নকেই বোঝাবে, ডাক্তার সাবিত্রী-প্রসন্নকে বোঝাবে না, তার কোনো মানে থাকবে না ?"

"না, তার কোনো মানে থাকবে না।"

ঈষৎ চিন্তাকুল মুখে অনিল বললে, "তা হ'লে ত ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে দাঁড়ল দাদা !"

বললাম, "গোলমেলে দাঁড়াল মানেই স্পষ্টতা হারাল। আর, স্পষ্টতা হারানোর অর্থই হ'ল বিষ্ণু ভায়ার 'out of focus effect' লাভ।"

একটা উচ্চ হাস্যরবে কক্ষ চকিত হয়ে উঠল।

অনিল বললে, "আমার ব্যবস্থা তা হ'লে কি হবে বলুন ত ?"

বললাম, "একবার যখন তুমি আসল নামে প্রকাশ পেয়েছ, তখন আর তোমাকে ঢাকা দেওয়া সম্ভব হবে না ; সমীর ভট্টাচার্যের দ্বারা ত নয়ই, সমীরণ ভট্টাচার্যের দ্বারাও নয়।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "এমন কি, প্রভঞ্জন ভট্টাচার্যের দ্বারাও নয়।"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্য উত্থিত হ'ল।

তিন জনের জন্য তিন পেয়ালা ধূমায়িত চা এবং কিছু সংশ্লিষ্ট বস্তু এসে পড়ল।

একটা পেয়ালা নিজের দিকে টেনে নিয়ে একবাব চুমুক দিয়ে অনিল বললে, "ব্যক্তি-নাম সমস্যা ত একটা যা হোক সমাধান হ'ল, কিন্তু বৈঠকের নাম নিয়েও একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বিষ্ণুবাবু।"

আর একটা পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে বিষ্ণু নাগ বললে, "কি সমস্যা ?"

"শেষ বৈঠক নামের 'শেষ' কথাটা অনেকেই পছন্দ করেছেন না।"

"আপনি ?"

"আমিও করছি নে।"

"কেন ?"

"দাদার বিষয়ে 'শেষ' কথাটা এবই মধ্যে শুনতে আমরা একেবারেই প্রস্তুত নই।"

অনিলের কথায় বিষ্ণু নাগের ভ্রূযুগলের মধ্যে মৃদু কুঞ্চন দেখা দিলে। বললে, "কিন্তু, শেষ কথাটা দাদাকে ব্যবহার করতে হ'লে এর মধ্যেই ব্যবহার করতে হয়, নইলে ব্যবহার করবার সুযোগের অভাব ঘটতে পারে। তা ছাড়া, শেষ বৈঠক যে অচিরেই শেষ হবে, এমন কথা ভাববারই বা কি কারণ আছে ?"

এবার কথা কইলাম আমি। বললাম, "একাধিক কারণের মধ্যে একটা প্রবল কারণও আছে ভায়া। কিন্তু, সে থাক্ আর না থাক্ অমন মিষ্টি শব্দটি আমি না ব্যবহার ক'রে ছাড়ব না। বল

কি! জন্ম দিয়ে যে-জীবন শুরু করতে পারলাম, মৃত্যু দিয়ে তা শেষ করতে এত কুণ্ঠা?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "আচ্ছা, সে আলোচনা পরে হবে, আপাতত শেষ বৈঠক শেষ হবার প্রবল কারণটা কি বস্তু শুনি?

বললাম, "অঞ্জনা।"

"অঞ্জনা? অঞ্জনা মানে?"

"অঞ্জনা মানে যিনি আমার অন্তরে অবস্থান ক'রে হৃদয়কে সময়ে সময়ে নিদারুণভাবে বিচলিত করেন; ডাক্তারী ভাষায় যাঁর নাম Angina pectoris। হৃদয়নিবাসিনী সেই সর্বনাশিনীকে আমি আদর ক'রে নাম দিয়েছি ঃ অঞ্জনা। কেমন? নামটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বিষ্ণু নাগ বললে, "খুব বেশীরকম হচ্ছে। কিন্তু এ রোগ তোমার কতদিন থেকে আছে?"

"তা, দীর্ঘকাল থেকে। দেবীর সঙ্গে একটা আপোস ক'রে টিকে আছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই একদিন দয়া ক'রে আমার পরপারের নৌকোর হাল ধরবেন এ বিশ্বাসও আমার আছে।"

উৎফুল্ল মুখে অনিল বললে, "সে এক ভারি অদ্ভুত ব্যাপার বিষ্ণু-বাবু! একবার অ্যাঞ্জাইনার সাংঘাতিক আক্রমণকালে দাদা দেবীর আরাধনা করেছিলেন।" আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে অনিল বললে, "বলুন না দাদা, আপনার সেই অপূর্ব স্তবটা।"

বললাম, "কণ্ঠস্থ ত নেই, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখো-পাধ্যায়ের 'চিকিৎসা-জগৎ' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তোমরা দুজনে একটু গল্প কর, দেখি ও-ঘরের আলমারিতে খুঁজে যদি পাই!"

সৌভাগ্যক্রমে কতকটা সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল।

প্রথমে একটা শেল্‌ফে না পেয়ে অপর একটা শেল্‌ফ্‌ একটু নাড়াচাড়া করতেই চোখে পড়ল নীলাভ রঙের কাগজের মলাটের একটা বইয়ের কোণ। টেনে বার ক'রে দেখলাম, অভীপ্সিত বস্তুই বটে—১৩৫৭ সালের কার্তিক মাসের ডাক্তারী মাসিকপত্র 'চিকিৎসা-জগৎ'।

এত কম কষ্টে জিনিস খুঁজে পাওয়া সুলভ সৌভাগ্যের কথা নয়। জীবনে সহজে খুঁজে পেয়েছি যদি দশবার, খুঁজে হায়রান হয়ে নিষ্ফল হয়েছি বোধ করি শতবার। আর এমনই মজা, সময়ে যে-সব জিনিস খুঁজে পাই নি, সেগুলির অধিকাংশের সাক্ষাৎ মিলেছে অন্য কোনও জিনিস খোঁজবার নিরর্থক প্রচেষ্টার সুযোগে। স্বরলিপির খাতা খুঁজে পাই নি, তার বদলে পেরেছি অন্য একদিনের না-খুঁজে-পাওয়া ধোপার খাতা। আবার মুদীখানার জিনিসের ফর্দ খুঁজতে গিয়ে হয়ত পেয়েছি সেদিনের না-খুঁজে-পাওয়া স্বরলিপির খাতা।

দেখে-শুনে মনে হয়, এ যেন ঠিক সহজ সাধারণ ঘটনাচক্রই নয়, যেন এর মধ্যে পরিহাসের একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্তও আছে। যে অলক্ষ্য অশরীরী কৌতুকী জানলার সুপ্রশস্ত ফাঁক দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করতে যাওয়া বস্তুকে গরাদের শীর্ণ দেহে ঠোকা লাগিয়ে একাধিক বার ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে দিয়ে মানুষের সঙ্গে রঙ্গ করে, সেই কৌতুকীই স্বরলিপির খাতার স্থলে ধোপার খাতা জুগিয়ে রেখে মজা দেখে।

ঘরে ফিরে আসতে আমার হাতে বই দেখে উৎফুল্ল মুখে অনিল বললে, "পেয়েছেন দাদা ?"

বললাম, "হ্যাঁ, পেয়েছি।"

"তা হ'লে অঞ্জনার স্তবটা পাঠ করুন। কিন্তু যে অবস্থায় স্তবটা রচিত হয়েছিল তার একটু ইতিহাস দিলে ভাল হয়।"

মাথা নেড়ে বিষ্ণু নাগ বললে, "না না, অনিলবাবু, একটুই বা কেন, অঞ্জনা-আখ্যায়িকার সম্পূর্ণ ইতিহাস শোনা যাক।" আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "রসের পরিবেষণে কার্পণ্য করতে নেই। গোড়া থেকে বল।"

বললাম, "অঞ্জনা-আখ্যায়িকার গোড়া ত অনেক দিনের কথা। ধৈর্য থাকবে ত ?"

"পরীক্ষা নিয়ে দেখ।"

অনিল বললে, "পরীক্ষায় আমরা দুজনেই উত্তীর্ণ হব দাদা।"

"তবে শোন।" ব'লে বলতে আরম্ভ করলাম।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ।

সপরিবারে দেওঘরে অবস্থান করিছি। সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ এল আমার নাতির বিবাহে কন্যার গৃহে শ্রীহট্ট যাওয়ার। বরকর্তা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জামাতা, কলেজে আমার সমসাময়িক, পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুবোধ লিখছেন, 'ছোট কাকা, আসা চাই-ই। আপনার জন্য টিকিট কেনা, সীট্ রিজার্ভ করা থাকবে।'

কন্যাপক্ষ ধনী জমিদার। শুনেছি বরের বিবাহ-সভায় যাবার শোভাযাত্রায় হাতী-ঘোড়ার সমারোহ থাকবে। দেওঘর হতে

শ্রীহট্ট—বিহার হতে আসাম। তার উপর হাতী-ঘোড়ার ব্যবস্থা। মন্দ কি! যাওয়াই স্থির করলাম।

তিন-চার দিন হ'ল কলিকাতা থেকে আমার দৌহিত্র শ্রীমান্ ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন আত্মীয়-আত্মীয়া আমাদের কাছে বেড়াতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে একত্রে কলিকাতা যাওয়া স্থির হ'ল।

২৪শে এপ্রিল।

বিকালের ট্রেনে কলিকাতা রওনা হতে হবে। বেলা দুটো আন্দাজ সুটকেস নিয়ে দশ-পনের দিনের উপযোগী প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি গুছিয়ে নিতে বসেছি। এমন সময়ে অকস্মাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই সমস্ত হৃদয় জুড়ে সমারোহের সহিত শ্রীমতী অঞ্জনার আবির্ভাব! আলিঙ্গনের নিবিড়তায় বিচলিত হয়ে উঠলাম।

প্রথমে মনে করলাম তীব্র বেগের ফিক্ ব্যথা। কিন্তু আক্ষেপের ঔৎকট্য উপলব্ধি ক'রে আততায়িনীর আভিজাত্য সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না। অবিলম্বে সরকারী হাসপাতালের তরুণ চিকিৎসক ডাঃ বরাটকে তলব করলাম। ডাঃ বরাট এসে পরীক্ষা ক'রেই বুঝলেন জীবন-তরী ঝটিকাক্রান্ত হয়েছে, শক্ত মাঝির প্রয়োজন। অবিলম্বে ডাকিয়ে পাঠালেন দেওঘরের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রায় সাহেব সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। রায় সাহেবের গম্ভীর মুখের আশ্বাস শুনে এবং রোগপরিচর্যার তোড়জোড় দেখে বুঝলাম, এ যাত্রায় বরযাত্রা ত নিশ্চয়ই নয়, হয়ত বা মহাযাত্রাই।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু বরযাত্রা এবং মহাযাত্রা দুই-ই নিবর্তিত হ'ল, —মাস চারেক শয্যাগত থেকে অ্যাঞ্জাইনার মারাত্মক আক্রমণ

কাটিয়ে সেরে উঠলাম। রোগ গেল বটে, দেহটা কিন্তু ঝটিকাদীর্ণ নৌকার মতোই জীর্ণ হয়ে রইল। সতর্ক সাবধান হয়ে নদীর কূলে কূলে চলা-ফেরা করা চলে, গভীর জলে পাড়ি দিতে ভয় হয়।

বছর দশ-এগার পূর্বে রোগটা হয়েছিল ব'লেই বোধ হয় বেঁচে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তখনকার দিনে আজকালকার মতো করোনারি থ্রম্বোসিসের চলন ছিল না। থাকলে এমন ক'রে আর আমাকে শেষ বৈঠকে বসতে হত না। ডাক্তাররা অবশ্য বলেন, রোগ ছিল, নাম ছিল না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন এই তোলা যেতে পারে যে, আজকাল খবরের কাগজ খুললে দুই-একটা করোনারি থ্রম্বোসিসে মৃত্যুর সংবাদ সদাসর্বদাই পাওয়া যায়, কিন্তু অ্যাঞ্জাইনা-পেক্টোরিসে মৃত্যুসংবাদ একেবারেই পাওয়া যায় না কেন? উত্তরে ডাক্তাররা যদি বলেন, 'রোগ আছে নাম নেই'—তা হ'লে অবশ্য নাচার।

বিষ্ণু নাগ বললে, "আমার বিশ্বাস, দশ বছর আগে করোনারি থ্রম্বোসিসের রুগীরা যেমন অ্যাঞ্জাইনা-পেক্টোরিসের নামে সেরে উঠত, আজকাল ঠিক তেমনি অ্যাঞ্জাইনা-পেক্টোরিসের রুগীরা করোনারি-থ্রম্বোসিসের নামে মারা যাচ্ছে।"

এ কথায় আমরা তিন জনেই হেসে উঠলাম।

বিষ্ণু নাগ বললে, "এবার আখ্যায়িকা আবার আরম্ভ কর।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বলতে আরম্ভ করলাম।

বৎসর ছয়েক পরের কথা।

১৯৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পাটনা সায়ান্স কলেজের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব সেরে এবং অপর কয়েক সভায় বক্তৃতাদি ক'রে কতকটা ঘায়েল হয়ে কলকাতায় ফিরলাম। দীর্ঘকালের

অবসরে দেহ-তরী খানিকটা দুরন্ত হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ৩৩৮ মাইল 'গভীর জলে' পাড়ি দেবার মতো যথেষ্ট বোধ হয় না।

১৭ই সেপ্টেম্বর উত্তরপাড়ায় এক সভায় প্রধান অতিথির গাওনা গছা আছে ; অথচ মাঝে মাঝে বক্ষের ভিতর বিপদের রক্তনিশান আন্দোলিত হচ্ছে। সাধারণত ওরূপ অবস্থায় সাবধান হওয়াই উচিত। কিন্তু চিরদিন জীবন-পথের বেপরোয়া পথিক,—মনে মনে বললাম, এমন ত ছ বছর মাঝে মাঝে হয়েই আসছে—ও কিছু নয়।

আমার তরুণ বন্ধু শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শুধু সুকবিই নন, একজন বিচক্ষণ এম্-ডি ডাক্তারও। উত্তরপাড়া সভার উদ্যোগ-আয়োজনের সঙ্গে তাঁর বোধ করি সামান্য কিছু যোগ ছিল। আমার শারীরিক বেভাবের কথা অবগত হয়ে তিনি বললেন, অপর কোনো ড্রাইভার কর্তৃক চালিত গাড়িতে আমার গিয়ে কাজ নেই ; তিনি নিজের গাড়ি নিজে চালিয়ে সন্তর্পণে আমাকে নিয়ে যাবেন। গাড়িতে আমাকে শুইয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও একবার করেছিলেন ; কিন্তু সেরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থায় আমি কোনো মতেই সম্মত হই নি। পিছনের সীটে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে যাওয়ার চেয়ে ডাক্তারের পাশে খাড়া হয়ে ব'সে গল্প করতে করতে যাওয়াকে নিরাপত্তার দিক থেকেও অধিকতর বাঞ্ছনীয় ব'লে সাব্যস্ত করেছিলাম।

সভার দিন যথাসময়ের বেশ কিছু পূর্বেই হেমেন্দ্রনাথের গাড়ি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য হাজির হ'ল। এতটা অতিতৎপরতার তাৎপর্য তখন বুঝি নি। হেমেন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ ক'রে দেখি, কক্ষের মধ্যস্থলে সদ্য-বিস্তৃত ধপধপে বিছানা আর তার শিয়রে মাথার বালিশ।

আমাদের উপস্থিত অভিসন্ধির সহিত এরূপ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ঠিক খুঁজে না পেয়ে একটু বিস্মিত হলাম ; কিন্তু ততোধিক বিস্মিত হলাম যখন শুনলাম সে ব্যবস্থা আমার জন্যই অভিপ্রেত।

চকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "এত সোফা-চেয়ার থাকতে বিছানায় শোব কেন ?"

স্মিতমুখে হেমেন্দ্র বললেন, "দশ-বারো মাইল পথ মোটরে যেতে হবে, সভাতেও পরিশ্রম আছে, ঘণ্টাখানেক শুয়ে থেকে একটু বিশ্রাম ক'রে নিন।"

প্রতিবাদ করলাম। বললাম, "কিন্তু আমি ত এখন সুস্থ আছি, বিশ্রাম কিসের জন্যে ?"

হেমেন্দ্রনাথের মুখে সেই মৃদু হাসি। বললেন, "সুস্থই যাতে থাকেন, বিশ্রাম সেই জন্যে।"

বুঝলাম, কবি হেমেন্দ্রনাথের মধ্যে উপস্থিত ডাক্তার উদগ্র হয়েছে। Prevention is better than cure—চিকিৎসা-শাস্ত্রের সেই সতর্ক বাণী ডাক্তারকে প্রভাবান্বিত করছে। অগত্যা শয্যার উপর উপবেশন করলাম।

কিন্তু তাতেও রেহাই পেলাম না। হেমেন্দ্রনাথ বললেন, "আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি ; আপনি ততক্ষণ শুয়ে প'ড়ে একটু ঘুমিয়ে নিন।"

কতকটা কাতর স্বরে বললাম, "ঘুম হবে না ডাক্তার চ্যাটার্জি।"

ডাক্তার চ্যাটার্জি কিন্তু অনিবারণীয়; বললেন, "শুয়ে চোখ বুজে থাকলেও খানিকটা বিশ্রাম হবে।"

অগত্যা শুয়ে চোখ বুজলাম। সন্তুষ্ট হয়ে ডাক্তার অন্দরে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু বড় জোর মিনিট দুই। তারপর উঠে প'ড়ে সোজা হয়ে ব'সে বাঁচলাম। শুয়ে জেগে থাকা সহজ; কিন্তু শুয়ে চোখ বুজে জেগে থাকা সময়বিশেষে একটা শাস্তি।

ডাক্তার মানুষ, বোধ হয় কিছু পূর্বে 'কল' থেকে ফিরেছিলেন। আহারাদি সেরে প্রস্তুত হয়ে হেমেন্দ্রনাথ যখন বৈঠকখানায় উপস্থিত হলেন, আমি তখন মাথার বালিশ কোলে চেপে সানন্দে ব'সে আছি।

ক্ষণকাল পরে কবিশেখর এসে যোগ দিলেন। বেলা তিনটে আন্দাজ আমরা কয়েক জনে উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হলাম।

উত্তরপাড়া সভার সভাপতি ছিলেন তদানীন্তন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতার অন্য এক সভায় তাঁর উপস্থিত হবার কথা ছিল। তাঁর বক্তব্য প্রথমেই শেষ ক'রে তিনি কলকাতা রওনা হলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়।

সভা হয়েছিল উত্তরপাড়া মুখুজ্জেদের এক শরিকের গৃহে। উপলক্ষ্য ছিল শরৎচন্দ্রের জন্মদিবসোৎসব। সুতরাং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথাই বলতে হয়েছিল, অনেক গল্পই শোনাতে হয়েছিল। তার উপর শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের একটি করুণ কাহিনী বলতে গিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট একটি শরৎ-প্রশস্তির গানও গাইতে হয়েছিল।

এইখানেই অত্যাচারের শেষ হয় নি। সভাশেষে জলযোগের পর পুরমহিলাগণের অনুরোধে একাদিক্রমে আরও তিনটি গান গাইতে হয়েছিল। তখন টের পাই নি চারটি গানের চতুর্বিধ রাগের তাড়নায় শ্রীমতী অঞ্জনা ভিতরে ভিতরে রাগত হয়ে উঠেছেন।

আমার গল্পে বাধা দিলে বিষ্ণু নাগ; বললে, "কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা বলি।"

বললাম, "মনে করলেও বল।"

"সভা-সমিতিতে তোমার গান গাওয়া ক্রমশ বন্ধ করলেই ভাল হয়। ঠিক কি-না?"

উত্তর দিলে অনিল ভট্টাচার্য; বললে, "হ্যাঁ, ঠিকই বলতে হবে। গান গেয়ে দাদা সময়ে সময়ে নিজের ওপর অত্যাচার করেন।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "পরের ওপরও করেন।"

কথাটার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করতে না পেরে অনিল বললে, "পরের ওপর কেমন ক'রে করেন?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "মোটামুটি গান গেয়ে। দেখুন অনিলবাবু, কলা দু রকম আছে; এক মর্তমান কলা, আর দ্বিতীয় শিল্পকলা। মর্তমান কলা যত মোটা হয় তত হয় উপাদেয়; কিন্তু শিল্পকলার বিপরীত ধর্ম। গান যে শিল্পকলা তা নিশ্চয়ই মানেন।"

অনিল বললে, "তা মানি; কিন্তু আপনি কি বলতে চান দাদা মোটা গান করেন?"

"আপনি কি বলতে চান আপনার দাদা খুব সূক্ষ্ম গান করেন?"

বাক্যের মধ্যে বেশ খানিকটা বেগ সঞ্চারিত ক'রে অনিল বললে, "নিশ্চয়ই বলতে চাই। তা যদি না করেন, সভায় অত হাততালি পড়ে কেন?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "মোটা গানেও যারা খুশী হয় সেই সাধু ব্যক্তিরা দেয় হাততালি; যারা খুশী হয় না তারা চুপ ক'রে

থাকে। আর একটু ধৈর্য হারালে তারা ক্রমশ শিস দিতে আরম্ভ করবে।”

এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে অনিল একটা জোরালো কিছু বলবার উপক্রম করছিল, কিন্তু তার সুযোগ পেলে না; আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিষ্ণু নাগ প্রশ্ন করলে, “তুমি কি মনে কর উপেন? মোটা গাও, না, সূক্ষ্ম?”

বললাম, “অবশ্য মোটা।”

“তবে গাও কেন?”

“বোধ হয় মনের আনন্দে। জান ত, স্ত্রী নেই শ্বশুরবাড়ি যায় পূর্বের সম্বন্ধে, আর গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে।”

মাথা নেড়ে বিষ্ণু নাগ বললে, “না, মনের আনন্দেই শুধু নয়। ‘মনের আনন্দে’ হচ্ছে শাক দিয়ে তুমি মাছ ঢাকবার চেষ্টা করছ।”

মনে মনে পুলকিত হয়ে বললাম, “মাছটা কোন্ বস্তু জানাবার জন্যে উৎসুক হয়েছি।”

বিষ্ণু নাগ বললে, “মাছটা হচ্ছে তোমার দুর্বলতা,—তুমি যে সভায় ব'সে গাইবার উপযুক্ত গায়ক ঠিক নও, এই ধারণায় বলিষ্ঠ না হতে পারার দুর্বলতা।”

বললাম, “ধন্যবাদ। এবার থেকে বলিষ্ঠ হতে চেষ্টা করব। তোমার কথায় মনে হচ্ছে এ দুর্বলতা আমার আছে।”

বিষ্ণু নাগ বললে, “শুধু এ দুর্বলতাই নয়, আরও কিছু দুর্বলতা তোমার আছে।”

কপট আতঙ্কের সুরে বললাম, “কি সর্বনাশ! আমার সাহিত্য-সাধনার বিষয়েও আছে না কি?”

গভীর কণ্ঠে অনিল বললে, "বলুন আছে ?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "একদিনে সব দুর্বলতার কথা বললে আবার আপনি আমার বিরুদ্ধে আলাপের প্রথম দিনের মতো কঠোর হয়ে উঠবেন। অবান্তর কথা অনেক হ'ল, এবার গল্প শোনা যাক।" আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আরম্ভ কর।"

পুনরায় বলতে আরম্ভ করলাম।

উত্তরপাড়া থেকে কলকাতা রওনা হতে রাত্রি প্রায় দশটা বেজে গেল।

পথটা এক রকম সহজ ভাবেই কাটল। বাড়ি ফিরে শয্যা-গ্রহণ ক'রে কিন্তু শরীরটা অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। কেমন যেন নিশ্বাসের কষ্ট হয়, উঠে উঠে বসি, ঘুম হয় না। সারারাত কাটল অনিদ্রায় ও বিঘ্নিত নিদ্রায়। কয়েক দিন চলল এই ধরনের উপক্রমণিকা-পর্ব। কখনো একটু ব্যথা দেখা দেয়, কখনো ভাল থাকি।

তারপর অকস্মাৎ একদিন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে দেখি, সমস্ত বক্ষ জুড়ে অ্যাঞ্জাইনা-পেক্টোরিসের রুদ্র লীলা আরম্ভ হয়ে গেছে।

সেবারের সে আক্রমণ কাটিয়ে উঠতে মাস তিনেক শয্যাগত থাকতে হয়েছিল।

১লা অক্টোবর। মধ্যাহ্ন থেকে বেদনাটা আবার নূতন ক'রে উগ্র মূর্তি ধারণ করলে। সন্ধ্যার সময়ে আমাকে দেখতে এলেন বৈবাহিক শ্রীমান্ সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমলের সহিত তাঁর একমাত্র সন্তান শ্রীমতী গোপার বিবাহ হয়েছে। সুবলের কিছু পরেই এলেন ডাক্তার সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখন যন্ত্রণা চরমে পৌঁছেছে। অল্প বেদনার কালে

অস্থির হয়ে এ-পাশ ও-পাশ ক'রে সামান্য একটু যে স্বস্তি পাওয়া যায় তাও দুর্লভ হয়েছে ব'লে স্থির হয়েই বেদনা সহ্য করছি।

নাড়ী, প্রেসার প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে দেখে এবং যন্ত্রণাদির বিবরণ শুনে মনে হ'ল ডাক্তার চ্যাটার্জি একটু যেন চিন্তিত হয়েছেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের ললাটে দুশ্চিন্তা রোগীর সম্মুখে সাধারণত রেখাপাত করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডক্টর চ্যাটার্জি শুধু চিকিৎসকই নন, আত্মীয়ও। তিনি আমার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী রমার স্বামী। তাই হয়ত আত্মীয়তার ভারে দুশ্চিন্তার কাছে ঈষৎ পরাজিত হয়ে থাকবেন। এমনও হতে পারে আমারই মনের চিন্তা তাঁর ললাটের উপর দুশ্চিন্তার ছাপ ফেলেছিল।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে সুবলের হাতে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "ওষুধ দুটো আনিয়ে রাখুন, ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার আসছি।"

ডাক্তার প্রস্থান করলেন। সুবলকে বললাম, "সুবল, কাগজ-কলম নিয়ে আমার পাশে একটু ব'স ত।"

প্রস্তাব শুনে সুবল ভায়ার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। ভাবলেন, অবস্থা তা হ'লে খুবই সাংঘাতিক; কাগজ-কলম দিয়ে উইল-টুইলের মতো কিছু ক'রে যাবার মতলব। কিন্তু সম্পত্তি ত কিছু নেই। উইল তা হ'লে কিসের হবে? ভাবলেন, হয়ত প্রতিবেশীদের এক-একখানা বাড়ি এক-এক ছেলের নামে লিখে দিয়ে মৃত্যুকালে উইল করবার একটা শখ মিটিয়ে আর মৃত্যুর পরে মামলা-মকদ্দমার একটা ভজকট বাধিয়ে যেতে চান।

আমার বাম পাশে একটা চেয়ারে ব'সে কাগজের উপর কলম উদ্যত ক'রে করুণকণ্ঠে সুবল বললেন, "বলুন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বললাম, "লেখ—

হে অঞ্জনা, এ কি খেলা খেলিছ কৌতুকে!
অকরুণ স্পর্শ তব সঞ্চারিয়া বুকে

সুবলের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তা হ'লে উইল নয়, কবিতা! সামনের দেওয়ালে ক্লক্-ঘড়ি ধীরে ধীরে পেণ্ডুলাম দোলাচ্ছিল। চেয়ে দেখে সাতটা কুড়ি সময় তাড়াতাড়ি কাগজের এক পাশে টুকে নিয়ে হৃষ্ট মুখে সুবল বললেন, "বলুন বেহাই মশায়, 'হে অঞ্জনা, এ কি খেলা খেলিছ কৌতুকে! অকরুণ স্পর্শ তব সঞ্চারিয়া বুকে' —তার পর?"

বললুম, "তার পর লেখ—

করিয়া রেখেছ মোরে অস্থির চঞ্চল!
বুঝি না ছলনাময়ি, এ কি তব ছল!
সত্য যদি চাহ মোরে, নিবিড় বন্ধনে
বক্ষ মোর বাঁধো তুমি। সুতীব্র স্পন্দনে
সকল পরাণ মোর উঠুক কাঁপিয়া।
তারপর তীব্রতম বেদনায় হিয়া
বারেক শিহরি যাক শান্ত স্তব্ধ হয়ে।
মর্ম-মাঝে মাঝে মাঝে শুধু র'য়ে র'য়ে
বাজুক করুণামাখা ওপারের সুর—
নিকটে আসুক যাহা আছিল সুদূর!

চুপ ক'রে বললাম, "হয়েছে?"

এক মুহূর্ত পরে অনুনয়ের কণ্ঠে সুবল বললেন, "বেহাই মশায়, আর দু লাইন হয় না?"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? বারো লাইন হয়েছে, চতুর্দশপদী করতে চাও?"

সুবল বললে, "হ্যাঁ।"

বললাম, "লেখ—

হে অঞ্জনা, হে প্রেয়সি, নহ তুমি অরি,
শেষের সঙ্গিনী মোর, আছ বক্ষ ভরি।

ডক্টর চ্যাটার্জি এলে অ্যাঞ্জাইনা কবিতা তাঁর হাতে দিয়ে সুবল বললেন, "দেখুন সুশীলবাবু, এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনার রোগীর কাণ্ড দেখুন!"

কবিতা পাঠ ক'বে এবং সমস্ত কাহিনী শুনে সুশীল অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন, এবং সুবলকে দিয়ে একটি নকল করিয়ে নিয়ে ডাক্তার-দের ক্লাবে দেখিয়েছিলেন। মারাত্মক ব্যাধির প্রতি একজন রোগীর এরূপ হৃদ্যতার আচরণ দেখে ডাক্তাররা যথেষ্ট কৌতুকান্বিত হয়েছিলেন; এবং বোধ করি রোগীদের সম্মুখে একটি সৎদৃষ্টান্ত স্থাপিত করবার উদ্দেশ্যেই কবিতাটি 'চিকিৎসা-জগতে' প্রকাশিত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

অনিল বললেন, "অঞ্জনা ত 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল দাদা?"

বললাম, "হ্যাঁ, সুবলের কাছে কবিতাটি দেখে অগ্রহান্বিত হয়ে সজনীবাবু 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত করেছিলেন।"

"অত যন্ত্রণার মধ্যে মুখে মুখে কবিতাটা কি ক'রে রচনা করলেন দাদা?"

মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে যে একেবারে পারি নে, তা নয়, কিন্তু ঐ অতি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেই ও-কবিতাটি রচনা করবার

প্রেরণা পেয়েছিলাম। অসহনীয় যন্ত্রণাকে প্রকাশ করবার একটা ভঙ্গী ভিন্ন ও-কবিতার আর কোনও কৈফিয়ত নেই।···অঞ্জনা নামটা তোমার কেমন লাগল বিষ্ণু?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "খাসা লাগল। মেরি থেকে মীরা অথবা লিলি থেকে লীলার মতো অ্যাঞ্জাইনা থেকে অঞ্জনা সুন্দর।"

আর খানিকটা গল্প-গুজব ক'রে একে একে বিষ্ণু নাগ এবং অনিল প্রস্থান করলে।

স্নানাহারের জন্য উঠি-উঠি করছি, এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন কন্যা অনুরাধার সহিত শ্রীমতী কমলা, এবং তৎপশ্চাতে কমলার স্বামী শ্রীমান্ দেবেশচন্দ্র দাশ। সর্বশেষে তুষারশুভ্র 'স্নোয়ী'—ধপধপে বৃহৎ কুকুর, যার দেহের মধ্যে একটি লোমেও মালিন্য নেই। স্নোয়ী দেবেশকে তার মনিবের স্বামী ব'লে বিবেচনা করে।

স্নোয়ীকে দেখে আমার ক্ষুদ্রকায়া স্বজাতিদ্রোহিণী লালী নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তারস্বরে প্রতিবাদ ঘোষণা করতে আরম্ভ করল। স্নোয়ী একবার নিঃশব্দে লালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, তারপর মনোযোগের অযোগ্য বিবেচনা ক'রে অবহেলার সহিত শ্রীমতী কমলার পায়ের কাছে ব'সে পড়ল। সেই অবহেলাকে ইংরেজী ভাষায় বলা চলে majestic indifference!

বৈঠক পুনরায় চনমনিয়ে উঠল।

৭

শেষ হয়ে আসা, এমন কি শেষ হয়ে যাওয়া আড্ডা যখন নবাগত কারণে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে তখন বুঝতে হবে সে নবাগত কারণের মধ্যে স্টীমশক্তির প্রাচুর্য আছে ; নচেৎ আড্ডার ব্রেক-কষা চাকা পুনরায় গতিলাভ করে না। আমাদের আড্ডার চাকাও পুনরায় গতিলাভ করলে।

দুই-তিন পালা চা-পানের পর স্নানাহারের বেলা বিলম্বিত লগ্নমানকেও ছাড়িয়ে গেছে, জঠরের মধ্যে ক্ষুধার হুতাশন স্ফুলিঙ্গ ছাড়তে আরম্ভ করেছে, পিত্ত পড়ার জন্য দুই দিকের দুই রগে মৃদু টিপ্‌টিপিনি ধরেছে, খাদ্যভারহীন লঘু দেহে অনুভূতি হয়ে উঠেছে ক্ষুরধার। অতি তীব্রতার সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যে আড্ডা নূতন ক'রে জমে, বিস্তার তার অল্প হ'লেও নিবিড়তায় তা জমাট হয়ে ওঠে। আমাদের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আড্ডাও অবিলম্বে জমাট রূপ ধারণ করলে।

স্নোয়ী ও লালীকে নিয়ে দু-চার মিনিট কথোপকথন হবার পর শ্রীমান্ দেবেশ প্রশ্ন করলেন, "শ্রীনগর স্টেট গেস্ট হাউস থেকে আপনাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম তা পেয়েছিলেন কি ?"

পেয়েছিলাম, কিন্তু উত্তর দিই নি। স্বীকার করলাম, "হ্যাঁ, পেয়েছিলাম।"

চিঠি পেয়ে উত্তর না দেবার আমার অশিষ্ট অভ্যাসকে প্রসন্ন চিত্তে ক্ষমা করতে যারা অভ্যস্ত হয়েছে সেই সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দেবেশ অন্যতম। তাই উত্তর না পাওয়ার অনুযোগের কোনও

সুর না তুলে দেবেশ বললেন, "সে ত অনেক দিনের কথা হ'ল— অক্টোবর মাসের মাঝামাঝির কম নয়, কিন্তু আপনি ত আমার অনুরোধ রাখলেন না ?"

অনুরোধ যে 'শেষ বৈঠক' নাম পরিবর্তনের বিষয়ে, তা বুঝতে বিলম্ব হ'ল না। দেবেশের চিঠিখানা 'শেষ বৈঠক' লেখার ফাইলে আছে, তা মনে আছে। কিন্তু চিঠিতে একাধিক অনুরোধ থাকাও ত অসম্ভব নয়। তাই বললাম, "কি তোমার অনুরোধ বল ত ?— 'শেষ বৈঠক' নাম পরিবর্তনের অনুরোধ ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দ থেকে বললাম, "এ অনুরোধ তোমার একারই নয় ; শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, সাদার্ন অ্যাভেনিউ থেকে শ্রীমতী বাণী রায়, এবং পাঁচু খানসামা লেন থেকে কবি শ্রীকৃষ্ণধন দে-ও 'শেষ বৈঠক' নামের 'শেষ' কথাটিতে আপত্তি জানিয়েছেন। তুমি 'শেষ বৈঠকে'র পরিবর্তে 'বিশেষ বৈঠক' প্রস্তাব করেছ, কৃষ্ণধন প্রস্তাব করেছেন 'চল্‌তি বৈঠক' ; আর বাণী রায় কি করেছেন জান ?"

সকৌতূহলে দেবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করেছেন ?"

"শেষ বৈঠক কথার সমীচীনতা সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, আপনার বৈঠকে আমরা উপস্থিত আছি। সে ক্ষেত্রে শেষ বৈঠক কথাটা কি সমীচীন ?"

আমি বলি, "সমীচীন না হবার ত কোনও কারণ দেখি নে। একটা বাগানের তরুণ গাছগুলি সবুজ পাতা আর ফুল ধারণ ক'রে আছে ব'লে তার মাঝখানের একটা শুকনো গাছ যদি সবুজ গাছ-গুলির দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে একদিন ভেঙে পড়ে, তাতে

অসমীচীনতার কি থাকতে পারে? সেদিনের ত বহু বিলম্ব থাকবার কথা নয় যেদিন তোমরা এসে দেখবে, শেষ বৈঠকের অতি-প্রাচীন বৈঠকী তার তল্পি-তল্পা গুটিয়ে স'রে পড়েছে।"

দেবেশ বললেন, "সেই অতিদুঃখের দিনের কথাটা আমরা আপনার শেষ বৈঠকের 'শেষ' কথার দ্বারা মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে আগাম দুঃখ পেতে চাই নে।"

বললাম, "দেখ, তোমাদের কথা হয়ত স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়। একটা বিশেষ দৃষ্টি-কোণ থেকে মানুষের জীবনের দুটো ভাগ আছে;—একটা 'জীবন-অনিশ্চিতে'র ভাগ, আর আর-একটা 'মরণ-সুনিশ্চিতে'র ভাগ। মোটামুটি জন্ম থেকে বছর ষাটেক বয়স পর্যন্ত মানুষের 'জীবন-অনিশ্চিতে'র অধ্যায়। সে অধ্যায়ে জীবন সাধারণ হিসেবে অনিশ্চিত ব্যাপার, যে-কোনো মুহূর্তে অবসিত হতে পারে, কিন্তু টেঁকে থাকার একটা জোরালো সম্ভাবনাও থাকে। ষাটের পর থেকে আরম্ভ হয় 'মরণ-সুনিশ্চিতে'র অধ্যায়, যে অধ্যায়ে জোরালো সম্ভাবনাটা টেঁকে থাকার দিক থেকে টেঁসে যাওয়ার দিকেই স'রে আসে। সে অবস্থায় মনকে চোখ ঠেরে মরণকে ভুলে থাকলে শশক-বৃত্তি হবে; পিছন দিক থেকে একদিন মৃত্যু এসে ল্যাজে ধ'রে টেনে নিয়ে গেলে অপমানের আর শেষ থাকবে না। তার চেয়ে মরণকে চোখের সামনে রাখাই ভাল, অগ্রভাগে দেখতে পেয়ে বলা যাবে, 'আসুন মহারাজ! প্রস্তুত আছি।'

"তা ছাড়া, দেবেশ, এই অতিপরিচিত অতিপ্রিয় পৃথিবী আমার পক্ষে শেষ হয়ে আসছে, জীবনের যত কিছু তুচ্ছ এবং মহৎ সঞ্চয়ের প্রতি মমতার বাঁধন আঁকড়ে থেকেও ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, এই দুর্লভ

উপলব্ধি বর্জনীয় নয়, সযত্নে মনের অন্তরে লালনীয়। স্তিমিত বৈরাগ্যের এই আনন্দ-চেতনা যদি মন থেকে কলমের ডগায় নামাতে পারি তা হ'লে 'শেষ বৈঠক' খানিকটা সরস হতে পারবে। জল পড়লে তবে জমি সবুজ হয়।"

কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, " 'শেষ' কথার বিষয়ে আপনার কি মত বলুন ? পরিবর্তনীয়, না, রক্ষণীয় ?"

কমলা কিছু বললেন না, শুধু একটু হাসলেন ; কিন্তু সে হাসির মধ্যে আমি, এবং সম্ভবত দেবেশচন্দ্রও, 'শেষে'র সপক্ষেই সমর্থন লাভ করলাম।

আরও ক্ষণকাল কথোপকথনের পর দেবেশ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "অনেক বেলা হয়েছে, আজ এই পর্যন্ত।"

দেবেশকে দাঁড়াতে দেখে স্নোয়ী কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, অর্থটা—তুমিও উঠছ না-কি, তা হ'লে আমিও উঠি।

কমলা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "অনেক দিন থেকে ত আপনার দিল্লী যাবার কথা ; এবার চলুন, গিয়ে কিছুদিন আমাদের কাছে থাকবেন। এখন ত আপনার চোখ অপারেশন হয়েছে, দেখবার ত আর কোনও অসুবিধে নেই !"

মনে মনে বললাম, দেখবার অসুবিধেই যদি একমাত্র অসুবিধে হত তা হ'লে চোখ বেঁধেও ত অনেক-কিছুই করা যেতে পারত। প্রকাশ্যে বললাম, "হ্যাঁ, এবার একবার যেতে হবে।"

স্নোয়ী সহ দেবেশ, কমলা এবং অনুরাধা নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

* * * *

নাঃ, 'শেষ বৈঠক' তাতে আর সন্দেহ নেই। দেবেশের 'বিশেষ বৈঠক'ও নয়, কৃষ্ণধনের 'চল্‌তি বৈঠক'ও না। 'বিশেষ' ব'লে তার

ঠেলা সামলাবে কে ? আর, 'চল্‌তি'র মধ্যে ত গতির কোন স্থায়ী প্রতিশ্রুতি নেই। একমাত্র নিরবধি কাল ছাড়া, আজ যা চল্‌তি কাল তা অচল,—তা কারবারই বল, জীবন বল, আর নদীই বল। কৃষ্ণধনের মতো বড় কবিকে কবিতাব দোহাই দেওয়া ধৃষ্টতা। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক লিট্‌ল্ সাহেবের ক্লাসে অঙ্ক কষবার খাতায় একদিন লিখেছিলাম—

জীবন যদি নদী বল, সাগর তবে কে ?
হাস্যমুখে মৃত্যু বলে, আমি আমি সে।

সুতরাং চল্‌তিরও স্থিতির সাগর আছে।

"উপেনদা ! উপেনদা বাড়ি আছেন ?"

বাড়ির সম্মুখে একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনেছিলাম ; দ্বিতলের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, পথে একটা বৃহৎ অভিজাত মোটর-কার দাঁড়িয়ে, আর তার গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন লালগোলাধিপতি রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

উচ্চকণ্ঠে বললাম, "আছি। যাচ্ছি।"

গাড়ীর দরজা খুলে উপর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নামতে নামতে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "আসুন,—ঝটিতি।"

আলনা থেকে একটা জামা নিয়ে গায়ে দিয়ে নেমে গেলাম।

বৈঠকখানায় প্রবেশ ক'রে দেখি, ইতিমধ্যে ফরাসের উপর দণ্ডায়মান হওয়ার ফলে ধীরেন্দ্রনারায়ণের দীর্ঘ ঋজু দেহ দীর্ঘতর হয়েছে। পিছন ফিরে তিনি দেওয়ালে বিলম্বিত কোনো লেখা নিবিষ্ট-মনে পাঠ করছেন।

বললাম, "রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়।"

একান্তে ধীরেন্দ্রনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ হ'লে সর্বপ্রথমে 'রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়' অর্থাৎ 'রাজন্, তব যশোভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ'—এই দুটি ছত্রের যে-কোনো একটির দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করার শখ আমার আছে।

পশ্চাৎদিক হতে সম্বোধিত হয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সহাস্যমুখে তক্তাপোশের উপর হতে অবতরণ ক'রে ধীরেন্দ্রনারায়ণ

বললেন, "রাজা নই, মহাতাপস ত নিশ্চয়ই নই,—তবে আপনার প্রাণের প্রিয় কি-না তা ঠিক জানি নে।"

বললাম, "ঠিকই জানেন; না জানলে 'ঠিক জানি নে' কখনো বলতেন না,—'জানি নে'ই বলতেন।"

বস্তুতঃ, ভাল-লাগাকে যদি প্রাণের প্রিয় হওয়া বলা চলে তা হ'লে ধীরেন্দ্রনারায়ণ নিশ্চয়ই আমার প্রাণের প্রিয়। ধীরেন্দ্র-নারায়ণের সহিত আমার কোনো-কোনো বিষয়ে আকাশ ও প্রান্তরের ব্যবধান থাকলেও আকাশ ও প্রান্তর যেরূপ দিক্‌চক্রে মিলিত হয়, সেইরূপ সাহিত্য ও সঙ্গীতের রুচিচক্রবালে ধীরেন্দ্রনারায়ণের সহিত আমার একাত্মতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্ততঃ শব্দ-চয়নের বিষয়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং আমার উভয়েরই এরূপ মারাত্মক নিষ্ঠা যে, স্থলবিশেষে 'সুতরাং' এবং 'অতএব'য়ের মধ্যে কোন্‌টা সুষ্ঠুতর প্রয়োগ হচ্ছে তা নিয়ে সময়ে সময়ে তর্কের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায়।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের রুচি সাধারণতঃ সর্বাতোমুখী হ'লেও ধ্রুপদের সপক্ষেই বোধ করি আমাদের উভয়ের পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী। এর প্রমাণ আমরা উভয়ে মাঝে মাঝে দিই ধীরেন্দ্র-নারায়ণের বসবার ঘরের টেবিলের দুই দিকে দুজনে সামনা-সামনি ব'সে। আমি তন্ময় হয়ে মাথা ও হাত নেড়ে হয়ত সুর ফাঁকতাল তালের 'আদিনাথ প্রণবরূপ' গানের কর্তব করি, আর আমার প্রতি প্রদীপ্ত-নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে সাগ্রহে দু হাত চাপড়ে টেবিলের উপর ধীরেন্দ্রনারায়ণ পাখোয়াজের বোল তোলেন। গানের শেষে তেহাইয়ের উপর ধীরেন্দ্রনারায়ণ দুই হাতের এমন সংযুক্ত আঘাত দেন যে, টেবিলের উপরেব কাগজচাপা কলমদান প্রভৃতি বস্তুগুলো বোধ হয় আনন্দেই নৃত্য ক'রে ওঠে। আমাদের এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-

আসরের একমাত্র শ্রোতা ধীরেন্দ্রনারায়ণের খাস পরিচারক নধরপুষ্ট বিষ্টু। অন্তরাল থেকে সঙ্গীত ও সঙ্গতের ঐকান্তিক হৃদ্যতা উপভোগ ক'রে, আমার বিশ্বাস, সে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

শুধু সঙ্গতেই নয়, সঙ্গীতেও ধীরেন্দ্রনারায়ণের অধিকারের প্রমাণ পেয়েছি। অবশ্য সঙ্গীত-আসরে ব'সে কাঁধে তানপুরা ফেলা অবস্থায় নয়, কিন্তু কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে। এক সময়ে নিশ্চয়ই তিনি সঙ্গীতের রেওয়াজ করতেন, অন্যথা অমন সুরেলা উদাত্তমধুর কণ্ঠস্বর আসবে কোথা থেকে?

সেই কণ্ঠস্বরের কল্যাণেই ধীরেন্দ্রনারায়ণ উচ্চাঙ্গের আবৃত্তিকার। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা এবং গানের তিনি প্রগাঢ় অনুরাগী। তিনি যখন তাঁর স্নিগ্ধগভীর কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা আবৃত্তি করেন তখন তা সত্যই উপভোগের বস্তু হয়। এই আবৃত্তি বিষয়ে খানিকটা তালিম তিনি পেয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে। বাল্যকালে অধ্যয়নার্থে ধীরেন্দ্রনারায়ণ আত্মীয় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এবং পরস্পরে নিজ নিজ গৃহে প্রায়ই মিলিত হতেন। বালক ধীরেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে আবৃত্তি-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সাহিত্যে ধীরেন্দ্রনারায়ণের সাধনা বহুমুখী। একাধারে তিনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পলেখক, শিকার-কাহিনী-রচয়িতা, কবি এবং গীতিকার। সাহিত্যে এই প্রতিভা এবং অনুরাগ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছেন তাঁর দেশমান্য পিতামহ গৃহী-সন্ন্যাসী স্বর্গীয় মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট হতে।

মহারাজা যোগীন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন পরোক্ষভাবে সাহিত্যিকের স্রষ্টা। যে সাহিত্য-প্রীতি তাঁর মধ্যে কোরকরূপে দেখা দিয়েছিল, ধীরেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে তা ফুল হয়ে ফুটেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়ে নানারূপে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও উপকার সাধন করেছেন। তন্মধ্যে একটি কাহিনীর মধ্যে বেশ-একটু নাটকীয় কৌতুক পাওয়া যায়।

তখন সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তথাকার উচ্চপদস্থ কর্মী। একদিন সার্ গুরুদাসের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, "দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরিটা দশ হাজার টাকায় বিক্রি হতে চলেছে। কোন্ মর্ম্মজ্ঞানহীন ধনীলোক খ্যাতির লোভে কিনে অমন মূল্যবান জিনিসটাকে পোকায় খাইয়ে দেবে। এ বিষয়ে আমাদের একটু তৎপর হওয়া উচিত।"

ঈষৎ চিন্তিত কণ্ঠে সার্ গুরুদাস বললেন, "উচিত নিশ্চয়ই। কিন্তু অত টাকার সামগ্রীর সুব্যবস্থা আমাদের—"

সার্ গুরুদাসকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, "মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ কিন্তু উপস্থিত কলকাতায় আছেন।"

"আছেন?" নিমেষের মধ্যে সার্ গুরুদাসের মুখমণ্ডল হতে চিন্তার মেঘ খানিকটা অপসৃত হ'ল; বললেন, "অবিলম্বে তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।"

পরদিনই গুরুদাস-সকাশে উপস্থিত হয়ে মহারাজা যোগীন্দ্র-নারায়ণ বললেন, "আমাকে স্মরণ করেছেন সার্?"

সার্ গুরুদাস বললেন, "হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে বিশেষ জরুরি কথা

আছে। দেখ, রামেন্দ্রসুন্দর বলছিলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরিটা দশ হাজার টাকায় বিক্রি আছে। কোন্ মূল্যবোধহীন লোক খ্যাতির লোভে হয়ত কিনবে; তার পর অযত্নে প'ড়ে থাকবে, একমাত্র পোকা ছাড়া আর কারো উপকারে আসবে না।”

মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ বোধ হয় সার্ গুরুদাসের কথার নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রেই বললেন, “কি আপনার আদেশ বলুন?”

সার্ গুরুদাস বললেন, “আমার ইচ্ছে লাইব্রেরিটা তুমি কেনো।”

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে মহারাজা বললেন, “যে আজ্ঞে, তাই হবে।”

রামেন্দ্রসুন্দর মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের আত্মীয়। সম্পর্ক-হিসাবে তিনি ধীরেন্দ্রনারায়ণের দাদামশায় হতেন। মহারাজার নিকট তিনি উপস্থিত হ'লে মহারাজা বললেন, “দেখুন রামবাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরিটা সার্ গুরুদাসের অনুরোধে আমি কিনতে চাই। ওর মূল্য দশ হাজার টাকা, আর প্যাক ক'রে লাল-গোলায় বই পাঠাবার উপযুক্ত অর্থ আমি আপনাকে দিচ্ছি, আপনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন।”

প্রস্তাব শুনে রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ শুকাল। তিনি বললেন, “টাকার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আমি সব ব্যবস্থা করছি।”

অবিলম্বে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, “সার্, হয়েও যে সব ভেস্তে গেল!”

কৌতূহলী হয়ে সার্ গুরুদাস জিজ্ঞাসা করলেন, “কি ভেস্তে গেল হে?”

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, “লাইব্রেরি কিনতে মহারাজা ত রাজী হয়েছেন, কিন্তু বই সব উনি লালগোলায় নিয়ে যেতে চান।”

বিস্মিত স্বরে সার্ গুরুদাস বললেন, "নিজের জিনিস নিজের জায়গায় নিয়ে যাবেন, এতে ভেস্তে যাবার কি আছে ?"

স্মিত অপ্রভিত মুখে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, "ওটা কিন্তু আমি লালগোলার জন্যে চেষ্টা করছিলাম না, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্যেই করছিলাম।"

সার্ গুরুদাস বললেন, "সে অভিসন্ধি তোমার স্পষ্ট ক'রে আমাকে জানানো উচিত ছিল।" এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বললেন, "আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি !"

সার্ গুরুদাস মহারাজাকে চিঠি লিখে পাঠালেন,—তুমি বঙ্গ-সাহিত্যের অনন্যসাধারণ পৃষ্ঠপোষক, তুমি বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরির বইগুলি লালগোলায় লইয়া গেলে ওগুলির সদ্‌গতিই হইবে। তবে আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরির বহুসংখ্যক গ্রন্থ যেরূপ গুরুবিষয়ক এবং প্রয়োজনীয়, তাহাতে লালগোলার পরিবর্তে বই-গুলি কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে থাকিলে অনেক অধিক লোক উপকৃত হইবে। এ-বিষয়ে তোমাকে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।"

মহারাজা উত্তর দিলেন, "আপনার প্রস্তাব আমি সানন্দে শিরোধার্য করিলাম। বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরির গ্রন্থগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরই সম্পত্তি হইবে।"

এইরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ আর-একবার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক মূল্যবান উপকারে উপকৃত হয়েছিল।

ফরাস হতে অবতরণ ক'রে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "চলুন।"

প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না, তথাপি জিজ্ঞাসা করলাম "কোথায় ?"

ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "আমার বাড়ি।"

ঈষৎ আপত্তির স্বরে বলাম, "কিন্তু এখন একটু কাজ আছে। কাল যাব।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "কাল গেলে চলবে না, আজই যেতে হবে, সকাল-সন্ধ্যায় তুবার। সকালে গুরুতর প্রয়োজনের আহ্বানে, আর সন্ধ্যায় জলসার বিশেষ আমন্ত্রণে।"

বললাম, "আপনার দৌলতখানায় না গিয়ে, গুরুতর প্রয়োজনটা ত আমার গরিবখানার বৈঠকেও সম্পন্ন করা যেতে পারত।"

ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "আমি যখন আপনার বৈঠকের অনুরাগী বৈঠকী, তখন নিশ্চয়ই পারত; কিন্তু শিকার যখন আমার বাড়িতে প'ড়ে রয়েছে তখন তা দেখতে আপনাকে যেতেই হবে।"

কথার প্রচ্ছন্ন অর্থ উপলব্ধি করতে বিলম্ব হ'ল না। তবু বললাম, "শিকার? কি শিকার?"

মুখে-চোখে আন্তরিকতার রেখা ফুটিয়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "রীতিমত রয়াল বেঙ্গল।"

বললাম, "কত লম্বা? পৃষ্ঠা দশেক হবে?"

হো-হো ক'রে হেসে উঠে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "তা হবে।"

ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং আমি একই পল্লীর অধিবাসী। তাঁর চার নম্বর মার্লিন পার্কের খিড়কির দরজা আমাদের বালিগঞ্জ প্লেসে এসে খোলে। তাই কোনো লেখা আমাকে শোনাতে ইচ্ছে হ'লে তু মিনিট আমার গৃহে উপস্থিত হয়ে ছোঁ মেরে আমাকে নিয়ে যান। বললাম, "যেতেই যদি হয়, ওপর থেকে একটু বেশ পরিবর্তন ক'রে আসি।"

ব্যস্ত হয়ে মাথা নেড়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "না না, একটুও পরিবর্তন করতে হবে না,—যেমন আছেন, তেমনি চলুন।"

আপত্তির সুরে বললাম, "এই আধ-ময়লা জামা গায়ে, আর অপরিচ্ছন্ন চটি পায়ে ?"

ঘাড় নেড়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "অতি অবশ্য। ওরই দাম দেয় কে !"

বললাম, "এই বেশে আপনার পাশে ব'সে গেলে আপনার দুর্নাম হবে রাজা-রাও ! পথের লোক বলবে, রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ আভিজাত্য হারাতে আরম্ভ করেছেন।"

উত্তর এল, "রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ সে দুর্নাম ঠিক তেমনি আনন্দে বহন করবেন, যেমন আনন্দে চাঁদ বহন করে তার কলঙ্ক।"

এর পর অপরিবর্তিত বেশেই যেতে হ'ল।

রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের বৃহৎ অট্টালিকার দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত বারান্দায় ব'সে শিকার-কাহিনী শুনতে লাগলাম।

রমেন্দ্রনারায়ণ নামক এক বলিষ্ঠ সুন্দর যুবক একদিন একটি সুন্দরী তরুণী শিকারিণীর সহিত হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে বাঘ শিকারে নির্গত হয়েছিলেন। সমস্ত দিনের পর শিকারশেষে দেখা গিয়েছিল, রমেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং শিকারীভূত হয়েছেন ; এবং তরুণী শিকারিণী একসঙ্গে দুটি শিকার করেছেন—একটি বাঘ আর একটি মানুষ। নানা বিস্তারে সুবিস্তৃত এই সরস কাহিনীর উপসংহারে রমেন্দ্র এবং সুন্দরী শিকারিণী পরমাত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

গল্পের নায়ক রমেন্দ্র যে আসল নয়, পরন্তু আবরণ—এই অদৃশ্যেছ্য সংশয় নিয়ে গৃহে ফিরলাম।

বিদায়কালে ধীরেন্দ্রনারায়ণ সন্ধ্যাকালের সঙ্গীত-আসরের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

বললাম, "সম্ভবত আসব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "না না, সম্ভবত নয়, নিশ্চয়ই। আপনি এসে ব'সে মাথা নাড়লে তবে আসর জমবে।"

নিজের মাথা নাড়ার এমন আশ্চর্যজনক ক্ষমতার সংবাদ অবগত হয়ে পুলকিত চিত্তে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

গৃহে পৌঁছে দেখি, বিষ্ণু নাগ বৈঠকখানায় ব'সে দৈনিক সংবাদ-পত্র পাঠ করছে।

বিষ্ণু নাগকে দেখে মনে মনে খুশী হলাম।

কিছুদিন যাবৎ তার মুখ থেকে শাণিত বাক্যের শরাঘাত না খেয়ে মনের চামড়ায় বোধ হয় একটু চুলকানি ধরেছিল। খুশী হলাম আজ তার খানিকটা নিরসন হতে পারে আশা ক'রে। একেবারে কাছ-ঘেঁষে ব'সে বললাম, "তার পর, খবর কি ভায়া?"

খবরের কাগজটা মুড়ে রাখতে রাখতে বিষ্ণু নাগ বললে, "সক্কালবেলা রাজবাড়ি এক মার মেরে এলে, খবর ত তোমারই।"

মুহূর্তকাল অপেক্ষা ক'রে বললে, "তা হ'লে বড়লোকের বাড়ি গতায়াতের অভ্যেস আছে দেখছি!"

পুলকিত চিত্তে বললাম, "তা আছে। কিন্তু না থেকে উপায়ই বা কি বল?"

"কেন?"

"আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রায় সকলেই আমার চেয়ে সঙ্গতিপন্ন; সে কারণে তাদের বাড়ি যাতায়াত বন্ধ করলে আমাকে ত কতকটা এক-গোয়ালে হয়ে থাকতে হয়। তা ছাড়া, বিষ্ণু, বড়লোকের বাড়ি যাতায়াত হয়ত ভাল নয়; কিন্তু কিছু বেশী সম্পদ আছে মাত্র সেই অপরাধে বড়লোকের বাড়ি বর্জন করা আরও খারাপ। বড়লোকের বাড়ি যাওয়ার সপক্ষে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টেপাসের যুক্তির গল্প জান?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বিষ্ণু নাগ বললে, "হয়ত জানি, তবুও শুনি।"

বললাম, "ডাইওনিসিয়স্ নামে এক ব্যক্তি ছিল অতিশয় ধনবান, আর ততোধিক শয়তান। অ্যারিস্টেপাস্ মাঝে মাঝে তার গৃহে চড়াও হয়ে স্বকার্যসাধন করত। একবার অ্যারিস্টেপাস্ ডাইও-নিসিয়াসের নিকট উপস্থিত হ'লে শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে ডাইওনিসিয়াস্ বলে, 'আচ্ছা, আমরা ধনীলোকেরা ত কখনো তোমাদের পণ্ডিতদের বাড়িতে ধন্না দিই নে, তোমরা কেন আমাদের বাড়িতে ধন্না দাও?' উত্তরে অ্যারিস্টেপাস্ বলেছিল, 'তার মানে, আমরা পণ্ডিতেরা জানি কোথায় গেলে আমাদের অভাব মিটবে; কিন্তু তোমরা (মূর্খেরা) জান না কোথায় গেলে তোমাদের অভাব মিটবে'।"

অ্যারিস্টেপাসের গল্প শুনে খুশী হয়ে বিষ্ণু নাগ বললে, "নিজের অনুরোধে সম্মত করাতে পারছে না দেখে অ্যারিস্টেপাস্ একবার ডাইওনিসিয়াসের পায়ে ধরেছিল, সে গল্প জান?"

বললাম, "হয়ত জানি, তবুও শুনি।"

দুজনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম।

বিষ্ণু নাগ বললে, "অ্যারিস্টেপাসের পায়ে ধরার কথাটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তার বন্ধু-বান্ধব তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল, 'ছি-ছি অ্যারিস্টেপাস্, তুমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে শেষ পর্যন্ত পাপিষ্ঠটার পায়ে ধরলে?' উত্তরে অ্যারিস্টেপাস্ বলেছিল, 'কিন্তু ও পাপিষ্ঠ যদি ওর কান দুটো নিজের পায়ে লাগিয়ে রাখে, অপরাধ তা হ'লে আমার কোথায় বল?"

হেসে বললাম, "না, অপরাধ তা হ'লে অ্যারিস্টেপাস্দের নিশ্চয়ই নয়। তোমার এ গল্প থেকে বড়লোকদের বাড়ি ধন্না দেবার এক দিকের একটা জোরালো যুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু জগতের সব বড়লোকই ডাইওনিসিয়াস্ নয়। ডাইনে বাঁয়ে

সম্মুখে পিছনে এমন অনেক বড়লোক দেখতে পাওয়া যায় যাদের ধনশালীতার কাঠিন্য সরস সৌজন্যের তলায় ঠিক তেমনি ভাবে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, যেমন নিমজ্জিত হয়ে থাকে কঠিন শিলাখণ্ড তরল নদীজলের তলায়। কিন্তু যেখানে শিলাখণ্ড জলস্তরের উপর আত্মপ্রকাশ ক'রে আবর্ত আর গর্জনের সৃষ্টি করে সে স্থান আমি মাড়াই নে বিষ্ণু ভায়া।"

অকপট আন্তরিকতার সহিত বিষ্ণু নাগ বললে, "সে স্থান তুমি মাড়াও না তা আমি অন্তর দিয়ে জানি। কিন্তু সে যাই হোক, আজ তোমার সুপ্রভাত সে কথা অস্বীকার করতে পার না।"

বললাম, "আজ প্রভাতে তুমি যখন উপস্থিত হয়েছ তখন নিশ্চয় পারি নে।"

"না, সে জন্যে নয়।"

"তবে?"

"রাজবাড়ি থেকে তোমার নিজের বাড়ি পর্যন্ত আজ পথের পদচারীদের এই কথা বুঝিয়ে ঈর্ষান্বিত করতে করতে এসেছ যে, তুমি একটি মূল্যবান মোটরকারের সৌভাগ্যবান মালিক। তোমার মোটরের হর্নের গভীর শব্দে চমকে উঠে হোঁচট খেয়ে কত প্রোলেটারিয়েট তোমাকে বুর্জোয়া ব'লে গালি দিয়েছে। তুমি জান, তোমার এই মহিমা অলীক; পথিকরা কিন্তু জেনেছিল, আসল।"

বললাম, "না, তারা যতটুকু জেনেছিল তাও অলীক। তারা জেনেছিল আমার মহিমা একজন বড়লোকের বাজার-সরকারের মহিমা, যে বাজার-সরকার হয়ত জরুরী ওষুধ আনবার জন্যে চলেছে মালিকের মোটর চ'ড়ে, আর সুবিধে পেয়ে পিছনের সীটে নিজেকে মহিমান্বিত করবার চেষ্টা করেছে।"

উত্তরে বিষ্ণু নাগ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুবিধে হ'ল না। দুটি তরুণী কক্ষে প্রবেশ ক'রে প্রণাম করলে।

বললাম, "বসুন।"

মেয়ে দুটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, অপ্রতিভ মুখে সে বললে, "বসুন ব'লে আমাদের অনাত্মীয় ক'রে রাখবেন না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে বোস।"

একটা সোফায় দুজনে কুণ্ঠিত হয়ে পাশাপাশি উপবেশন করলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "লেখা আছে ?"

অপ্রস্তুত হ'য়ে বড় মেয়েটি বললে, "না, লেখা নেই।"

মনে মনে আশীর্বাদ ক'রে বললাম, "তা হ'লে কি, সভা আছে ? গান-বাজনার জলসা ?"

"না, তা-ও নেই। এই মেয়েটি, এর নাম মায়া, আপনাকে কিছু বলতে চায়।" বিষ্ণু নাগের প্রতি একবার অপাঙ্গে ত্বরিত দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কিন্তু সে এমন কথা যে, বোধ হয় আমার সামনেও ও বলতে চাইবে না।"

ততক্ষণে বিষ্ণু নাগ জুতোর ভিতর পা গলাতে আরম্ভ করেছে। নমস্কার ক'রে সে প্রস্থান করলে।

এ ধরনের আগন্তুক এই প্রথম নয়। বললাম, "চল, আমরা তা হ'লে দোতলায় যাই। যে-কোনো মুহূর্তে এখানে লোক এসে অসুবিধে ঘটাতে পারে।"

সকালে উঠে স্যাকারিন-মিশ্রিত এক পেয়ালা চা ও স্যাকারিন-মিষ্টায়িত এক বাটি ওট্‌মিল্ পরিজের দ্বারা প্রাতরাশ সমাপন ক'রে মাস দেড়েকের নিত্যনৈমিত্তিক উট্‌কো কাজ নিয়ে বসেছি। সামনের হুইদের বাড়ির উচ্চতম শিখরে একটা পাখী—শালিক পাখী ব'লেই আমার বিশ্বাস, সেই অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব ডাকটা ডাকছে—টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ চর্‌র্‌র—টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ চর্‌র্‌র্! 'টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ টিক্'-টা বেশ উচ্চগ্রামে, আর তার পরই 'চর্‌র্‌র্'-টা বিস্ময় ও কৌতুকজনক ভাবে নিম্নগ্রামে। শুনতে বেশ মজা লাগে।

আমার পাঁচ বৎসরের পৌত্রী দিরা ( মন্দিরা ) আর আমি—আমরা দুজনে নিরতিশয় আগ্রহের সহিত প্রায়ই ঐ পাখীটার ডাক শুনি। মন্দিরার পাঁচ বৎসরের অনভিজ্ঞ দৃষ্টি নিঃসংশয়ে ধরতে পারে না ওটা শালিক কি-না; আর আমার চুয়াত্তর বৎসরের ক্ষীণ চোখও সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারে না। তবে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ এক সময়ে পাখীটা যখন উড়ে যায় তখন তার খয়েরী রঙের দেহে সাদা পালকের ঝিলিক দেখে মনে হয় শালিক।

শৈশবে পূর্ণিয়ায় অবস্থানকালে শালিক পাখীর সহিত আমার নিবিড় পরিচয় হয়েছিল। এক-এক দলে আট-দশটা ক'রে শালিক আমাদের অঙ্গনে, গৃহের আনাচে-কানাচে সুমধুর কাকলির সহিত চরে বেড়াত। আমাদের মা তাদের কাকলির দুটি আক্ষরিক বাণী

রচিত ক'রে আমাদের শিখিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে—ডঁ্যাপ্ ডঁ্যাপ্ পটো পটো পা-পিচি পা-পিচি খড় কিচি ফুড়ৎ। আর-একটি হচ্ছে—কক্যো কক্যো ত্যাপ্ ত্যাপ্ প্রিং প্রিং হুম্। প্রথমোক্তটি নিশ্চিন্ত অবসরের প্রমাণ-মাপের গীতি, আর শেষোক্তটি চকিত হয়ে উড়ে যাবার পূর্বেকার সংক্ষিপ্ত গৎ। বালিগঞ্জ প্লেসের আমার বর্তমান বাসস্থানেও শালিক পাখীর ডাক যথেষ্ট শুনতে পাই, কিন্তু টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ চর্‌র্‌র্ ডাক মাত্র কয়েক দিন থেকে শুনতে পাচ্ছি। সেই জন্যে নিঃসংশয়ে ঠিক করতে পারছি নে এটা শালিক কিংবা অন্য কোনও পাখী।

শালিক মানুষ-ঘেঁষা পাখী; চড়ুই কিন্তু মানুষ-মেশা। শালিক মানুষের কাছাকাছি চ'রে বেড়ায়; চড়ুই মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে একেবারে মানুষের ঘরের মধ্যে। বীমের ফাঁকে ফাঁকে অথবা ভেন্টিলেটারের আশেপাশে সে বাসা বাঁধে। আমার ঘরের পূর্ব-দিকের দেওয়ালে একটা ভেন্টিলেটার আছে, তার মাঝখানে একটা আড়াল। আড়ালের ভিতর দিকে বাসা বাঁধে চড়ুই, বার দিকে শালিক এসে ব'সে ডাক শোনায়—সেই চিরপরিচিত ডঁ্যাপ্ ডঁ্যাপ্ পটো পটো ডাক—টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ চর্‌র্‌র্, ডাক নয়। সে ডাক শুনতে পাই হুইদের অট্টালিকার উপরে, অথবা কাছাকাছি গাছপাতার ভিতর থেকে। সুতরাং মনে হয় এ পাখী হয়ত শালিক পাখী নয়।···পাখী সমানে ডেকে চলেছে। নাঃ, কাজ করতে দিলে না দেখছি!

"দাদা, কেমন আছেন? একতলার বৈঠক-ই-আমে শুনলাম, আপনার নাকি খুবই অসুখ, সিঁড়ি ভাঙা ডাক্তারের মানা। তাই আমিই সিঁড়ি ভেঙে বৈঠক-ই-খাসে আপনাকে দেখতে এলাম।"

লাল-নীল পেন্সিল রেখে অর্ধশায়িত অবস্থা থেকে খাড়া হয়ে উঠে ব'সে পিছন ফিরে বললাম, "বোস, বলছি।"

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সরকারী গভীর সাগর-জলের মৎস্য-শিকার দপ্তরের উচ্চ কর্মচারী, এবং বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান্ লেখক।

"কি ব্যাপার বলুন ত ?"

বাঁ হাতটা উলটে দেখালাম, এক জায়গায় লাল হয়ে ফুলে রয়েছে, আর সেই ফোলার উপর গোলাপী মখমলের উপর মটরের আকারের মুক্তার ন্যায় এগারটি সাদা সাদা ফোসকার কলোনি।

দেখে শিউরে উঠে রবি বলেন, "ইস্! এ কী রোগ দাদা ?"

বললাম, "এ রোগ নয়, রোগেব বহিঃপ্রকাশ। আসল রোগ শরীরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে উৎসাহের সহিত চিনি উৎপাদনে ব্যস্ত।"

"ডায়াবিটিস্ আছে আপনার ?"

"পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে ছিল, তারপর দীর্ঘকাল ছিল না। সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। রিপোর্ট বলে—টু পারসেণ্ট। কিন্তু শুধু রামচন্দ্রই নয় রবি, সুগ্রীবও আছেন।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ, নাড়ীর দোষও আছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে রবি বললেন, "নাড়ীর দোষ! নাড়ী মানে ?"

বললাম, "নাড়ী মানে ধমনী, যা ছাড়ামাত্র ইহলোকের সঙ্গে সকল কারবার বন্ধ হয়।"

আহ্ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!—সকৌতুকে হেসে উঠে রবীন্দ্র

বললেন, "আপনার নাড়ীর দোষ আছে, আর আপনি ব'সে ব'সে এই বিদকুটে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ ক'রে চলেছেন ?"

উত্তর দিলাম, "কি করি বল ? এর যে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে যার মধ্যে শেষ করতেই হবে। কিন্তু দোষযুক্ত নাড়ী শেষ করবার তেমন বাঁধাধরা কোনো মেয়াদ নেই, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এ কাজের মেয়াদকে সে টপকে যেতেও পারে। সুতরাং এ কাজটা শেষ করার চেষ্টা করাই ভাল।"

"কি হয়েছে আপনার নাড়ীর ? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে ?"

বললাম, "শুধু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নয়, ছিঁড়ে ছিঁড়েও। কি রকম চলেছে জান ? 'আছি' 'আছি' ক'রে চলতে চলতে চার-পাঁচটা 'আছি' চলছে, তার পর হয়ত তুটো 'নেই' ; তারপর আবার চারটে 'আছি'র পর হয়ত একটা 'নেই'। এই রকম 'আছি'-'নেই'য়ের লীলা চলতে চলতে হঠাৎ যখন চার-পাঁচটা 'নেই'য়ের পালা পরে পরে একসঙ্গে এসে পড়বে, জীবনের অস্তুতীরে তখন আর একটা 'আছি'ও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। স্প্রিং-ছেঁড়া ঘড়ি দেখ নি ? ঝাঁকানি দিলে যে স্বল্পতম দমটুকু অবশিষ্ট আছে, তার দ্বারা দু-চার সেকেণ্ড হয়ত কাঁটা সরে, তারপর আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই রকমে পাঁচ-সাতবার সরতে সরতে একবার যে বন্ধ হয় তারপর আর শত ঝাঁকানিতেও সরে না।"

"কী যে বলেন ! আহ্ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !—কই, দেখি আপনার হাতটা !"

ডান হাতখানা রবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "এ বিদ্যেও আছে না-কি তোমার ?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে সে আমার মণিবন্ধ

গ্রহণ ক'রে পরীক্ষা করতে উদ্যত হ'ল। ধমনীর উপর অঙ্গুলির-দু-চারটে আঘাত দিতেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে এল। গভীর নিবিষ্টতার সহিত ক্ষণকাল নাড়ী টিপে ধ'রে থেকে বললে, "সত্যি দাদা, এ যে ভারি গোলমেলে নাড়ী দেখছি! কি ব্যাপার বলুন ত ?"

বললাম, "কি ব্যাপার ডক্টর পালই নিশ্চয় ক'রে বলতে পারেন না, তা আমি অজ্ঞ রোগী কি ক'রে বলব ? তবে মোটের উপর বলতে পারি, মনে হচ্ছে 'দখিন দুয়ার খুলেছে'। ঘাড় হেঁট ক'রে মাথা গলাবার সময় উপস্থিত।"

"না না, ভয়ের কিছু নেই। ভয় পেয়েছেন নাকি দাদা ?"

"ভয় পেয়েছি কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু ভয় পাইয়েছি। আশীষ, অনিল প্রভৃতি কয়েক জনের চোখে যেন শোকের ছায়া নেমেছে।"

"আশীষ গুপ্ত এসেছিলেন না-কি ?"

"এসেছিলেন।"

"আচ্ছা, নাড়ীর এ রকম অবস্থা আজই হয়েছে ?"

"না, এ রকম নাড়ী ধরা পড়েছে দিন পাঁচেক আগে।"

"দিন পাঁচেক আগে ?" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রবীন্দ্র বললেন, "না, তা হ'লে চিন্তার কারণ নেই। এ রকম নাড়ীকে ভূতুড়ে নাড়ী বলে। এই রকম ভূতুড়ে নাড়ী নিয়ে আমার ঠাকুরদা তিন বছর বেঁচে ছিলেন। কোনো ভয় নেই আপনার।"

বললাম, "চুয়াত্তর বৎসরের জীর্ণ শরীর ত্যাগ ক'রে শ্রীমান্ আত্মা যদি নূতন শরীরে প্রবেশ করেন, তাতে ভয়ের কি থাকতে পারে ভাই ? কিন্তু ও আধ্যাত্মিক বাহাদুরির কথা ছেড়ে দিয়ে

তোমার ঠাকুরদার মতো আরও তিন বৎসর যদি বাঁচতে পারি তাতেও রাজী আছি। তিন বছরে আর কিছু যদি নাও পারি অন্ততঃ সেই কবিতাটা শেষ করব।"

"কোন্‌টা দাদা ?"

"যেটা মাত্র লাইন দুয়েক আরম্ভ ক'রে অনেকবার চেষ্টা ক'রেও আর এগোতে পারি নি।"

আগ্রহভরে রবি বললেন, "কি সে দু লাইন, বলুন না দাদা ?"

বললাম,

"যত কথা বলিবার ছিল তার
শতাংশও হ'ল নাকো বলা,
দেখিতে দেখিতে দেখি সন্ধ্যা হয়ে আসে দিন,
শেষ হয়ে আসে পথ চলা।"

প্রফুল্ল মুখে রবি বললেন, "শেষ ক'রে ফেলুন দাদা,—আপনার ত অসুখের অবস্থায় কবিতা লেখার অভ্যাস আছে। আহ্‌ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! আজ চলি, জরুরি কাজের তাড়া আছে, আবার আসব।"

"এসো।"

নমস্কার করে রবি প্রস্থান করলে। আমিও আবার আড় হয়ে লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে পড়লাম।

তিন জনেই রবিবারের বৈঠক জ'মে উঠেছিল।

যে বৈঠকে রসের চর্চা হয়, তথায় বৈঠকীর সংখ্যা গৌণ, রস-বেত্তার সংখ্যাই মুখ্য। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ; কিন্তু বৈঠক নষ্ট করবার জন্য অধিক অরসিকের প্রয়োজন হয় না, ব্যক্তিত্ব প্রবল হ'লে একজনই যথেষ্ট।

ধরা যাক, সময় সায়াহ্ন ; প্রশস্ত ফরাসের উপব সঙ্গীতের আসর বসেছে, কাঁধের উপর তানপুরা ফেলে গায়ক নিবিষ্ট চিত্তে ভূপালী রাগের কর্তব করছেন, শ্রোতারা বিমুগ্ধ মনে গীতসুধা পানে রত, এমন সময়ে একজন পুষ্টপেশী বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যকামী লেঙটধারী ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ ক'রে যদি সঙ্গীত-আসরের অনতিদূরে মেঝেতে দাঁড়িয়ে হাঁইও-হুঁইয়ো রবে ডন্-বৈঠক আরম্ভ করে, তা হ'লে ডন্-বৈঠকের ওঠা-বসার সহিত ভূপালী রাগের আরোহ-অবরোহ মৈত্রী স্থাপন করতে অসমর্থ হওয়ায় কক্ষের সঙ্গীত-পরিবেশ ছিন্ন হয়ে যায়।

ডন্-বৈঠক ত উগ্র ব্যাপার, সঙ্গীত-আসরের পক্ষে নিশ্চয়ই তা উপদ্রব। কিন্তু সেই লেঙটধারী ব্যক্তি যদি ধুতি-জামা পরিধান ক'রে ডন্-বৈঠকের পরিবর্তে সেই কক্ষের এক কোণে টেবিল চেয়ার নিয়ে ব'সে হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের দুরূহ অঙ্ক কষায় নিমগ্ন হয়, তা-হ'লেও তা সঙ্গীত-আসরের পক্ষে, উপদ্রব যদি একান্তই না হয়, অনুগ্র উৎপাত হয়ে দাঁড়ায়। হাইড্রোস্ট্যাটিক্স্ যেখানে বারোজন লোকের মধ্যে একটি লোককে ভূপালী রাগের সুরবেষ্টন হতে সরিয়ে রাখতে পেরেছে, সে আসরে ভূপালী রাগের মহিমা ক্ষুণ্ণ

হয়েছে বলতেই হবে। বারোটি যন্ত্রের ঐকতান বাদনে এগারটি যন্ত্র যদি সুরে বাজে এবং একটি বেসুরে, তা হ'লে সে বাদন আর ঐকতান বাদন থাকে না।

আমাদের তিনজন বৈঠকীর মধ্যে দুজন ছিলেন কবি, আর তৃতীয় ব্যক্তি কাব্যরসিক। সুতরাং বৈঠক সুর হারায় নি, যেমন সুর হারায় না তিনজনের সেই বৈঠক, যে বৈঠকে দুজন সন্দেশ-নির্মাতা আর আর-একজন সন্দেশবিলাসী।

বৈঠকের দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন প্রস্থান করলেন তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়েছে। স্নানাহারের জন্য উঠব-উঠব করছি, এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করলে বিষ্ণু নাগ।

খুশী হয়ে বললাম, "স্বাগত!"

একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে বিষ্ণু নাগ বললে, "কিন্তু রবি-বারের বৈঠক এরই মধ্যে একেবারে শূন্‌শান্ যে!"

বললাম, "তোমার শুভপ্রবেশ যখন হয়েছে, তখন আর শূন্‌শান্ কোথায়? শূন্য ত তুমি পূর্ণ করলে।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "করলাম কি-না জানি নে। কিন্তু ধর, যদি ক'রেই থাকি, তা হ'লে কজনের করলাম শুনি?"

বললাম, "বেশী নয়, দুজনের। আজ শুধু ক-বাবু আর স-বাবু এসেছিলেন। কিন্তু তিনজনের আড্ডার গভীরতা তার বিস্তারের অভাবকে পুষিয়ে দিয়েছিল। একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন উঠে শীর্ণ জমায়েতকে করেছিল জম্‌জমে।"

"কি সে প্রশ্ন?"

"প্রশ্ন ছিল, লেখকের সৃষ্টি লেখকের বয়সের পরিমাণকে মেনে চলতে বাধ্য কি-না।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "উক্তিটির প্রসঙ্গ নির্দেশ ক'রে ব্যাখ্যা কর।"

বললাম, "করি। আমার একটা নূতন গল্পের বই ছাপাখানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কোনো প্রসঙ্গে তার একটি গল্প ক-বাবু বৈঠকে পাঠ ক'রে শোনালেন। গল্পটি এক উচ্চশিক্ষিত কিন্তু উগ্রখেয়ালী যুবকের দুঃসাহসিক প্রণয়-অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। বিষয়বস্তুর অনুরোধে গল্পটি সরস। পাঠ শেষ ক'রে ক-বাবু গল্পটির প্রশংসা করলেন ; কিন্তু বললেন, গল্পটি যে আমার পূর্বকালের রচনা সেটা গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার ফুটনোটে উল্লেখ করলে ভাল হয়।"

উত্তরে আমি বললাম, "তেমন কথা ফুটনোটে উল্লেখ করা দুটি কারণে অসমীচীন হবে। প্রথমতঃ, ও গল্পটি পূর্বকালেব, অর্থাৎ আমার যৌবনকালেব বচনা নয়, মাত্র বৎসব দেড়েক আগে লিখেছিলাম ; দ্বিতীয়তঃ, আমার বয়সের লেখকের পক্ষে সরস প্রণয়-কাহিনী রচনার বিরুদ্ধে কোন নৈতিক কারণ নেই, সুতরাং সে বিষয়ে আমাব কোন কুণ্ঠা অথবা কৈফিয়ত থাকতে পারে ব'লে আমি মনে করি নে ; কারণ রস-অবতারণার ক্ষেত্রে লেখকের বয়স অপ্রাসঙ্গিক বস্তু, পাঠকের বয়সই প্রাসঙ্গিক।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "ঠিক যেমন চিনির রসের ক্ষেত্রে ময়রার স্বাস্থ্য অপ্রাসঙ্গিক বস্তু, ক্রেতার স্বাস্থ্যই প্রাসঙ্গিক। বহুমূত্র-রোগাক্রান্ত কোনো ময়রার পক্ষে চায়ে চিনি নিষিদ্ধ এবং স্যাকারিন বিধেয় ব'লে সে যে খদ্দেরের সন্দেশেও চিনির পরিবর্তে স্যাকারিন ব্যবহার করবে তার কোনো যুক্তি নেই।"

বললাম, "কিন্তু ক-বাবুর হয়ত ঠিক এই কথাটাই বলবার অভিপ্রায় ছিল না। চুয়াত্তর বৎসর বয়স্ক লেখকের গল্পের নায়ককে

বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক এবং নায়িকাকে আটষট্টি বৎসর বয়স্কা হতে হবে, অথবা দুজনে তরুণ হ'লেও লেখকের বয়সের ছোঁয়াচ লেগে উভয়কে বার্ধক্যভাবাপন্ন এবং সংযতবাক হতে হ'বে, যৌবনোচিত কোনো উচ্ছলতাই তাদের থাকবে না—এমন ইঙ্গিত তিনি নিশ্চয়ই করেন নি। তাঁর হয়ত বলবার উদ্দেশ্য ছিল, লেখকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লেখার তাল বজায় রাখতে পারলে ভাল হয়।"

মাথা নেড়ে বিষ্ণু নাগ বললে, "এ কথাও একেবারে ঠিক নয়। জাত-লেখক হচ্ছেন তিনি, যিনি সৃষ্টির অপরিবর্তনশীল রসপদ্মের উপর চিরদিন কায়েম থাকতে পারেন। তুমি নিজে লেখক ব'লে লেখকের কথাই কেবল বলছ, কিন্তু জাত-লেখকের মতো জাত-পাঠকেরও বয়সের বালাই নেই, সে কথাও জেনো। যে জাত-পাঠক সে যেমন দুর্মদ যৌবনকালে 'অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্, অনন্ত-বাহুং শশীসূর্যনেত্রম্, পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্' পাঠ ক'রে রসের সন্ধান পায়, তেমনি স্তিমিত বার্ধক্যের দিনেও 'সমাজ-সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কল-রব, কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব' প'ড়ে আনন্দলাভ করে। জীবনব্যাপী রসলোক তার কাছে নিত্য সনাতন অপরিবর্তনশীল সংস্থা।"

বললাম, "তোমার এ মন্তব্যের বিরুদ্ধেও কিন্তু কিছু তর্ক করা যেতে পারে।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "তা হয়ত পারে, কিন্তু আজ আর নয়, বিশদভাবে অন্য কোনও দিন করা যাবে। আজ আরম্ভ করলে ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি হ'য়ে হয়ত বলবেন—থাকুক তোমার স্নান ও আহার বিষ্টুরে নিয়ে থাকো।"

স্মিতমুখে বললাম, "বিষ্টুরে নিয়ে থাকো—গৃহকর্ত্রী বলতে পারেন ; কারণ তুমি যে আমার কত আপনার সে কথা বোঝেন তিনি।"

ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন ক'রে বিষ্ণু নাগ বললে, "চুপ।" তার পর হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

সন্ধ্যার পূর্বে 'নিশ্চেতন মন' উপন্যাসের সুলেখিকা শ্রীমতী শোভা দুই বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের উভয়ের বাড়ি শুধু কাছা-কাছিই নয়, একেবারে সামনা-সামনি।

বৈভবে এঁদের সঙ্গে আমাদের বৃহৎ নদীর ব্যবধান; অন্তরঙ্গতায় কিন্তু শীর্ণ নর্দমারও নয়।

পথের দুই দিকে সামনা-সামনি ঘরের রুজু-রুজু জানলা। ও দিকের ঘরে বাস করেন ও বাড়ির কর্তা ও গৃহিণী; এ দিকের ঘরে এ বাড়ির। চলতে-ফিরতে ও ঘর থেকে এ ঘরের এবং এ ঘর থেকে ও ঘরের হাল-চাল গতি-বিধি দেখা যাবার পক্ষে কোনও অসুবিধে নেই, একমাত্র ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুর পুরু লেন্সের অর্ধসক্ষম চশমা ভিন্ন।

এ বাড়ির ঘরে ব'সে আমি ফাউন্টেন পেন দিয়ে লিখছি, না, পেনসিল দিয়ে; অথবা আমার দুই বৎসর বয়স্ক পৌত্র শ্রীমান্ সুব্রতকে যে বস্তু দিয়ে খেলা দিচ্ছি, সেটা পেপার-ওয়েট, না, আমার পকেট-ঘড়ি ;—এ সকল ও ঘর থেকে ওঁরা স্পষ্ট দেখেন, এবং যখন বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয় নির্ভুল বিবরণ দেন।

আমি অবশ্য ও বাড়ির জানলায় আবছা মূর্তি দেখে সে মূর্তি গৃহস্বামী যতীন্দ্রবাবুর অথবা গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী শোভার—তত কঠিন সমস্যায় পড়ে নে; কিন্তু আমার সহিত চোখাচোখি হওয়ায় যতীন্দ্র-বাবু সাধারণ সৌজন্যের নিঃশব্দ হাসি হাসছেন, অথবা নীচে মালী ফুলগাছগুলির কিরূপ পরিচর্যা করছে তীক্ষ্ণনেত্রে তাই লক্ষ্য

করছেন, অত সূক্ষ্ম ব্যাপার ধরতে পারি নে। কি জানি, হয়ত আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছেন মনে ক'রে আমিও পাল্টা হাসি হেসে দিই।

বুঝতে পারি অনেক সময়েই এ রকম হাসি অযথা অকারণে অপচায়িত হয়। কিন্তু উপায় কি? চিনতে না পারা অথবা বুঝতে না পারা অপরাধের যে জরিমানা দিতে হয় তা থেকে ত অব্যাহতি পাওয়া যায়।

দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ার পর বহুবার এরূপ জরিমানা দিতে হয়েছে। উপস্থিত দুটি ঘটনার কথা মনে পড়েছে।

বৎসর তিনেক পূর্বের কথা। তখন আমার বাম চোখের দৃষ্টি ছানির পরিপক্ব আবরণে আচ্ছাদিত। ডান চক্ষে যেটুকু খণ্ডিত এবং বিকৃত দৃষ্টি আছে তার দ্বারা লেখা-পড়ার কাজ চলে,—এমন কি, যত ক্ষুদ্র অক্ষর হয় তত ভাল চলে;—কিন্তু দূর-দর্শনের চশমায় বৃহৎ বস্তু দেখা-শোনার কাজে ভুল-ভ্রান্তির প্রচুর অবকাশ। রমেশবাবুর লেখা চিঠি অনায়াসেই পড়তে পারি; কিন্তু রমেশবাবুকে চেয়ারে ব'সে থাকতে দেখলে সব সময়ে রমেশবাবু ব'লে চিনতে পারি নে। অচেনা লোকের আকৃতি ত কিছুতেই মনের মধ্যে স্থায়ী ছাপ মারতে চায় না, চেনা লোকের আকৃতিও সব সময়ে ঠিক পরিচিতরূপে ধরা দেয় না।

দৃষ্টিশক্তির অবস্থা যখন এই রকম চলেছে, বিহারের বেথিয়া শহর থেকে তথাকার অধিবাসী আমার বাল্যবন্ধু শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক চিঠি পেলাম। চিঠির এক স্থানে গিরীন লিখছেন, 'কয়েকদিন হ'ল কলিকাতা থেকে হরেনের এক চিঠি পেয়েছি। হরেন তোমার উপর বেশ-একটু ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছে—

উপেনের ভারি অহঙ্কার হয়েছে। কয়েকদিন আগে এক সভায় সে ছিল সভাপতি, আর আমি ছিলাম আমন্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন। দূর থেকে একাধিকবার আমি তাকে বন্ধুজনোচিত ইশারা করেছিলাম, কিন্তু সে একবারও আমার ইশারায় সাড়া দেয় নি; বলা বাহুল্য, প্রতিবারই সে আমার দিকে তাকাতে তবে আমি তাকে ইশারা করেছিলাম।'

হরেনের অভিযোগ সম্বন্ধে গিরীন মন্তব্য করেছে, 'তোমার এ রকম আচরণ অবিশ্বাস্য। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। কি ব্যাপার বল ত?'

ব্যাপার যা, গিরীনকে পরে বললেই চলবে; উপস্থিত তার চিঠি প'ড়ে হাসব, না, কাঁদব ভেবে পাই নে। হরেন আমাদের দুজনের অতি-অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু।

সেদিন হরেনকে একখানা চিঠি লিখলাম। হরেন আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। আসল নামে সে একজন অতি-পরিচিত ব্যক্তি, সে নামটা ব্যবহার করা সমীচীন মনে করছি নে।

হরেনকে আমার দৃষ্টিশক্তির অবস্থা পরিপূর্ণভাবে জানিয়ে লিখলাম, 'আচ্ছা হরেন, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম কি-না সে সম্বন্ধে না-হয় সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু তুমি যে আমাকে চিনতে পেরেছিলে সেটা ত সংশয়াতীত। তা হ'লে সভাভঙ্গের পর আমার কাছে উপস্থিত হয়ে আমার কানটা ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে না কেন—কিসের জন্যে এত অহঙ্কার তোমার হয়েছে যে ইশারা করলে সাড়া দাও না বল ত?—তা হ'লে ত হাতে হাতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যেত।'

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হতে বিলম্ব হয় নি। আমার

চিঠি পাওয়ামাত্র হরেন আমার বাড়ি এসে নিষ্পত্তি ক'রে গিয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে সে গিরীনের কাছে নালিশ করেছিল; নচেৎ একটা বড় তায়দাদের জরিমানা অজ্ঞাতসারে বহুদিন ধ'রে শোধ ক'রে যেতে হ'ত।

দ্বিতীয় ঘটনাটা যুগপৎ কৌতুক এবং কিছুটা করুণরসাত্মক।

বেলা তখন তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। বাড়ি ফিরব বালিগঞ্জ প্লেসে। ট্রামের অপেক্ষায় হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে ওয়াই-এম্-সি-এ-র বিপরীত দিকে গ্লোব নার্সারির ফুলের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। সঙ্গে আমাদের পাচক ছিতন ঝা।

হঠাৎ দেখি, বই-হাতে একটি সুশ্রী মেয়ে হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছে। চিনি-চিনি মনে হচ্ছে অথচ ঠিক চিনতে পারছি নে। মনে মনে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠে ঠিক করি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' পদ্ধতিতে কথা কইতে হবে, যাতে একটা অযথা কথা বলার ভুল না ক'রে বসি, অথচ মেয়েটি বুঝতে না পারে আমি তাকে ঠিক চিনতে পারছি নে।

কাছে এসে হাসিমুখে মেয়েটি বল্লে, "এদিকে কোথায় এসেছিলেন দাদামশায়?"

বললাম, "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, লেখকের দৌড় পাবলিশারের দোকান পর্যন্ত।"

তা যেন হ'ল, কিন্তু কে মেয়েটি! দাদামশায় সম্বোধনে কোনো কিনারা হ'ল না,—কলকাতা শহরে অন্তত ডজন পাঁচেক ঐ বয়সের আত্মীয় এবং অনাত্মীয় মেয়ে আছে যারা আমাকে দাদামশায় ব'লে ডাকে।

আমার নিরীক্ষাতীক্ষ্ণ সন্ধানপ্রয়াসী চোখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করলে, "এখন বাড়ি ফিরছেন বুঝি ?"

নাঃ, ভারি বিপদেই পড়া গেল ! চিনে ফেললাম চিনে ফেললাম করছি, অথচ চিনতে পারছি নে ! অনুৎসুক কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, বাড়ি ফিরছি।"

"ট্রামে, না, বাসে যাবেন ?"

"ট্রামে।"

"আমিও বাড়ি ফিরছি।"

"ও।"

যে প্রসন্ন উৎফুল্লতা নিয়ে মেয়েটি প্রথমে এগিয়ে এসেছিল তার উপর একটা যেন কিসের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। আমার উত্তরগুলির অতিসংক্ষিপ্ততার মধ্যে যে আগ্রহের অনিবার্য অভাব ব্যক্ত হচ্ছে সেই নৈরাশ্যেই কি ?···হঠাৎ খেয়াল হ'ল, এ পর্যন্ত আমি শুধু প্রশ্নের উত্তরই দিয়ে গিয়েছি, একটিও প্রশ্ন করি নি। এটা ভাল দেখাচ্ছে না। অন্তত একটা প্রশ্ন করা যাক।

কিন্তু প্রশ্নটা একেবারে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের হওয়া দরকার ; এমন অতি-সাধারণ নিরাপদ প্রশ্ন, যার মধ্যে আমি যে মেয়েটিকে ধরতে পারছি নে, তার কোনো ধরা-ছোঁয়া না থাকে। সেই রকম চমৎকার একটি প্রশ্ন মনে এল। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর ?—তোমাদের বাড়ির খবর সব ভাল ত ?"

ভাবলাম, আলাপের এই উভয়পক্ষত্বের কল্যাণে মেয়েটির মুখের বিমূঢ়তা খানিকটা তরল হবে। কিন্তু এ কি ! বিমূঢ়তার ছায়া যে আরও গাঢ় হয়ে উঠল। মেয়েটি আমার দিকে একটু সমস্যাবিহ্বল ভাবে তাকিয়ে থেকে বললে, "আমাদের বাড়ির খবর ?" এক মুহূর্ত

অপেক্ষা ক'রে বললে, "ভালই।" তার পর আর কিছু না ব'লে একটা সদ্য-আগত ১০নং বাসে উঠে লেডীস্ সীটে গিয়ে বসল। বাস ছাড়লে অপাঙ্গে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

কি আশ্চর্য। হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বিনা বিদায়-গ্রহণ ক'রে মেয়েটি চ'লে গেল, তারপর বাস থেকে একবার বক্রনেত্রে তাকিয়েও দেখলে ঃ তবে ওরও মনে, আমি উপেন গাঙ্গুলী অথবা অপর কেউ, তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয়েছে না-কি! না, ও-ই আর কেউ ব'লে আমাকে এতক্ষণ ভুল করছিল ?

দূরে পার্ক-সার্কাসগামী ট্রাম দেখা দিয়েছিল, পার্ক-সার্কাসে গাড়ি বদল ক'রে তবে বালিগঞ্জ যেতে হবে; তথাপি আমি বাস অপেক্ষা ট্রাম পছন্দ করতাম। ছিতনকে ট্রামটা দেখিয়ে হুঁশিয়ার ক'রে দিলাম, ঐ ট্রামে আমাদের উঠতে হবে।

ছিতন বললে, "দিদিমণি হাম লোকসে আগে পহুঁছ জাঙ্গে।"

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "তুম দিদিমণিকো পহচানতা হ্যায় ?"

ছিতন বললে, "জী হ্যাঁ, পহচানতা হ্যায়। উঅ তো হামলোকক। মহল্লামে সামনেকোঠিওয়ালী দিদিমণি হ্যায়।"

সামনেকোঠিওয়ালী দিদিমণি! কি সর্বনাশ! তপতী? যে সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার দিন এসে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে যায়! যাকে আমি আমার বউমা মা-গোপার চেয়ে কম চিনি নে! যার প্রতি আমার আপন নাতনীর মতই স্নেহ জাগ্রত আছে!—সেই তপতী?

ঠিকই ত! মিনিট দুই আগে দেখা চিনি-চিনি করা মেয়েটির মুখাবয়বে এমন সব বিশেষ বক্রতা, বিশেষ রেখা, বিশেষ সুষমা

এসে আশ্রয় নিতে লাগল যে দেখতে দেখতে নিঃসংশয়ে সেই মুখখানি সামনেকোঠিওয়ালী তপতী ছুইয়েরই হয়ে দাঁড়াল।

ছি-ছি, কি অন্যায়ই হয়েছে! যখন আমার তাকে বলা উচিত ছিল, 'কি তপতী, প্রেসিডেন্সী কলেজের পাঠ শেষ হ'ল? চল, তা হ'লে একসঙ্গে বাড়ি ফিরি', তখন কি-না আমি তাকে বলেছিলাম, 'তার পর? তোমাদের বাড়ির খবর সব ভাল ত?'

ট্রামেই যাই আর বাসেই যাই, সে যে সেদিন আমার সঙ্গে একত্র বাড়ি ফিরত, তাতে কোনো সন্দেহই ছিল না; কিন্তু ঘণ্টাখানেক পাশাপাশি ব'সে পাছে ঐরকম খাপছাড়া কথা শুনতে শুনতে যেতে হয়, বোধ হয় সেই ভয়েই বেচারী পালিয়ে বেঁচেছিল।

সে দিন তপতীর সহিত দেখা হয় নি। পরদিন সে এলে ঐ প্রসঙ্গে দুজনে হেসে বাঁচি নে।

১৩

পূর্বেই বলেছি সন্ধ্যার পূর্বে সামনের বাড়ির শ্রীমতী শোভা দুই বেড়াতে এসেছিলেন।

নিকটে একটা চেয়ার গ্রহণ ক'রে চিন্তিত-মুখে শোভা বললেন, "কি ব্যাপার কাকাবাবু?"

বললাম, "ব্যাপার ত মন্দ নয়।"

"আছেন কেমন?"

"ভাল আছি।"

"তবে যে ডাক্তাররা আপনাকে দেখতে আসা-যাওয়া করছেন? কাল দুপুরে দেখলাম দুজন ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করছেন। ভাবলাম, সন্ধ্যার সময়ে আপনাকে দেখতে আসব; কিন্তু সন্ধ্যা থেকে আপনার ওপর আর নীচের ঘরে আলো নেবানো দেখে ভাবলাম, আপনি হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছেন—যাওয়া উচিত হবে না। তারপর দশটায় দেখি, আপনি আলো জ্বেলে লিখে চলেছেন। আজ সকাল ছটার সময়েও দেখি, সেই আপনি ব'সে ব'সে লিখছেন। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, ব্যাপার কি?"

বললাম, "ব্যাপার খুবই সরল; আমার কাজ আমি ক'রে চলেছি, আর ডাক্তারদের কাজ ডাক্তাররা করছেন। আপাতত তাঁরা আমাকে রামনামের মন্ত্র পড়াচ্ছেন।"

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শোভা বললেন, "কি যে বলেন কাকাবাবু!"

বললাম, "ভয় পেয়ো না; ওঁ শ্রীরাম রাম—এই ষড়ক্ষরের

তারকব্রহ্ম মন্ত্র, যে মন্ত্র কাশীধামেও স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কানে দিয়ে পার করেন, সে মন্ত্রের কথা বলছি নে।”

সকৌতূহলে শোভা জিজ্ঞাসা করলেন, “তবে ডাক্তাররা আপনাকে রামমন্ত্র পড়াচ্ছেন তার কি মানে?”

বললাম, “তার মানে, দীর্ঘকাল থেকে আমার নাড়ী এলোমেলো ছন্দে চলে; কখনো বেশী কখনো হয়ত বা ঠিক—এই রকম এলোমেলো নাড়ীকে ভূতুড়ে নাড়ী বলে। সম্প্রতি আমার ভূতুড়ে নাড়ীতে ভূতের উপদ্রব একটু বেশী দেখা দিয়েছিল, তাই ডাক্তাররা রামনামের মন্ত্রের দ্বারা আমার নাড়ীব ভূতকে ভাগাবার চেষ্টায় আছেন। ভাগিয়েছেনও প্রায় সবটাই, যেটুকু বাকি আছে তার আয়ু বেশী দিনের নয়। তারক-ব্রহ্ম মন্ত্রের অক্ষর ছটি—ওঁ শ্রীরাম রাম; ডাক্তারদের রাম-মন্ত্রের সাতটি—ঔষধ ও বিশ্রাম। বিশ্রামের মধ্যেও রামনামের রেশ আছে।”

রাম-মন্ত্রের ভাষ্য শুনে পুলকিত হয়ে শোভা হাসতে লাগলেন। দু-চার কথার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “বেশীক্ষণ বসলে আপনার বিশ্রাম আর লেখা দুইয়েরই ব্যাঘাত হবে, আবার আসব, আজ চলি।”

“এস।”

অনেকের জীবন-বীণায় সংসারের মোটা তার ছাড়া আরও একটি-দুটি সূক্ষ্ম তার থাকে, যার অনুরণন জীবনের মোটা তারকে অতিক্রম না ক’রেও সুরেলা করে। ইংরেজীতে যাকে hobby বলে, আমি ঠিক সে ধরনের সূক্ষ্ম তারের কথা বলছি নে। সিনেমা দেখা, ফুলবল ম্যাচ দেখা, যাত্রা শোনা, ঘোড়দৌড়ে বাজি লাগানো—এ সবের কথা আমি বলছি নে; এগুলি hobby বা শখের শ্রেণীতে

অন্তর্ভুক্ত হবার উপযুক্ত। এগুলির সবগুলিকেই আমি হেয় অথবা অবহেলনীয় নিশ্চয় বলি না; কিন্তু আমার সূক্ষ্ম-তারের তালিকা আরম্ভ হচ্ছে, গ্রন্থ-পাঠ, ছবি-আঁকা, সাহিত্য-চর্চা, ধর্মানুশীলন, অধ্যাত্মসাধন প্রভৃতি থেকে।

শ্রীমতী শোভার জীবন-বীণায় দুটি সূক্ষ্ম তার আছে—একটি সাহিত্য-রচনাব এবং অপরটি অধ্যাত্মসাধনাব। একটির জন্য মন প'ড়ে থাকে খাতায়, অপরটির জন্য মঠে। কোথায় বেশী প'ড়ে থাকে সেটা আমি সব সময়ে ঠিক বুঝতে পাবি নে। শ্রীমতী শোভা রামকৃষ্ণ মঠেব বর্তমান প্রেসিডেন্ট-মহারাজ স্বামী শঙ্করানন্দের ভক্তিমতী মন্ত্র-শিষ্যা।

শোভা প্রস্থান করার ক্ষণকাল পরেই এলেন কবি কৃষ্ণধন দে।

"কেমন আছেন দাদা?"

বললাম, "ভাল। তুমি ভাল আছ ত?"

আসন গ্রহণ ক'রে কৃষ্ণধন বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি।"

টেবিলের উপর বর্তমান আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি' প'ড়ে ছিল। ক্ষণকাল একথা-সেকথার পর 'শনিবারের চিঠি'র উপর কৃষ্ণধনেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। কাগজখানা হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন।

বললাম, "এই সংখ্যায় শ্রীনারায়ণ চৌধুবী "প্রসঙ্গ-কথা"য় পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। মনে হ'ল কিছু কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ প্রবন্ধটিতে আছে।"

"পড়েছেন প্রবন্ধটা?

"ভাল ক'রে পড়ি নি, উলটে-পালটে দেখেছি।"

পাতা উলটে উলটে লেখাটা বার ক'রে কৃষ্ণধন বললেন, "পড়ব না-কি প্রবন্ধটা? শুনবেন?"

বললাম, "বেশ ত, পড় না।"

আগ্রহসহকারে কৃষ্ণধন প্রবন্ধটা পাঠ ক'রে শোনালেন।

পড়া শেষ ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল দাদা?"

বললাম, "খাশা লাগল। বিশেষতঃ নগরকেন্দ্রিক লেখকদের সপক্ষে দুশ্ছেদ্য ভাষায় নারায়ণবাবু যে নিপুণ ওকালতি করেছেন, এবং তাঁদের গ্রন্থের যথোচিত সংস্করণ না হওয়ার কৈফিয়তে তিনি যে অতি-আশ্বাসকর অভিজাত যুক্তি দেখিয়েছেন, তার জন্যে নগর-কেন্দ্রিক লেখক মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবে।"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে কৃষ্ণধন বললেন, "এ কথা আপনি কৌতুক ক'রে বলছেন না ত?"

ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "না না, মোটেই কৌতুক ক'রে বলছি নে। বস্তুত, লেখক যদি শুধু পাঠক-জনতার মুখ চেয়ে লেখেন, তা হ'লে সাহিত্য-কারবারের দিক থেকে হয়ত তা উপযুক্ত কাজই হয়, কিন্তু সাহিত্য-সাধনার দিক থেকে হয় না। যে লেখক সাহিত্য-সাধনা করবেন, তিনি নিজের সমস্ত শিক্ষা-সংস্কার-রুচি-সাহিত্যবোধ নিয়ে আত্মস্থ হয়ে লিখতে বসবেন; সম্মুখে একান্তই যদি কোনো পাঠক থাকেন ত দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসিক বিদগ্ধ পাঠক, একমাত্র প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট সাহিত্য-বস্তু ভিন্ন আর কিছুই যাঁর মনে রোচে না, তিনিই থাকবেন। তবেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য-বস্তু রচিত হবে। আর, তাতেও যদি না হয়, তা হ'লে ত পাশেই বাজে কাগজের ডালা আছে।"

কৃষ্ণধন বললেন, "এ কথা অস্বীকার করা যায় না।"

বললাম, "এই প্রসঙ্গে বছর তিনেক আগেকার একদিনের একটা ঘটনা মনে প'ড়ে গেল। দক্ষিণ-কলিকাতার বালিগঞ্জের এক প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-সভা। বক্তা বাংলা দেশের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। বিষয়বস্তুর ঠিক কি অভিধা ছিল মনে নেই, তবে সাহিত্যের ব্যঞ্জনা এবং ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত—সে কথা সেদিনকার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত ছিল, তা মনে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে বক্তা এক স্থানে বললেন, "সাহিত্যের ভাষা এ-রকম সহজ ও সরল হওয়া উচিত যাতে আমার অনুচর ও আমি ঠিক একই রকমে তা উপভোগ করতে পারি।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বললেন, "শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের ভাষা ঠিক সেই রকম ভাষা ; তাই তাঁর লেখা এত জনপ্রিয় হতে পেরেছে।"

এই মন্তব্য সভায় একটা মৃদু গুঞ্জন উত্থিত করলে।

আলোচনাটা যখন শেষ মীমাংসার জন্য আমার ওপর এসে পড়ল, আমিও প্রতিবাদ করলাম। বক্তাব কথার ভঙ্গী থেকে ধ'রে নেওয়া গিয়েছিল যে তাঁর অনুচর খুব উচ্চশিক্ষিত এবং মার্জিতরসবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না ; তা যদি থাকতেন ত তাঁকে সাক্ষী মানার কোনও অর্থই থাকত না। প্রতিবাদে আমি ব'লে-ছিলাম, 'সাহিত্যকে সর্বজনবোধ, এমন কি বহুজনবোধ্য করবার জন্য যৎপরোনাস্তি সরল এবং সহজ না ক'রে মামুলি পাঠক যাতে উন্নত রসবোধ অর্জন ক'রে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা উচিত। সাহিত্যকে নিম্নে অবতরণ করলে হবে না, পাঠককে উচ্চে আরোহণ করতে হবে।'

শরৎচন্দ্রের লেখার দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে বলেছিলাম, 'হাতের কাছে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ বই নেই, থাকলে দেখিয়ে দিতাম সে গ্রন্থে

পল্লীরমণী বিশ্বেশ্বরী সময়ে সময়ে যে রকম অপরূপ ভাষা আর ছন্দের সঙ্গে কথা কয়েছেন তেমন বোধ করি স্বয়ং শরৎচন্দ্রও কথায়-কথায় কইতে পারতেন না। অনেক কাটাকুটি অনেক রদ-বদলের পর শরৎ-চন্দ্রকে বিশ্বেশ্বরীর অনেকগুলি সংলাপকে চোস্ত করতে হয়েছিল।'

সব জিনিস সকলের জন্যে নয়; সব গ্রন্থও সব পাঠকের জন্যে নয়। 'বিনোদ-বিনোদিনী' উপন্যাস পাঠ ক'রে যে পাঠক চরম আনন্দ পান, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' তাঁর পক্ষে সুপাঠ্য বই নয় সে কথা স্বীকার করি; কিন্তু সেই অপরাধে যদি 'ঘরে বাইরে' গ্রন্থকে সাহিত্যের তালিকা হতে বাদ দিতে হয় তা হ'লে ত সেইখানেই সৎসাহিত্যের সমাধি। কথা-সাহিত্য ত শুধু ঘটনার সরলতম বিবরণ নয়; কত সূক্ষ্ম জটিল হৃদয়-সংঘাতের জাল বুনতে হয় সেখানে। সে জাল ভেদ করা সকল পাঠকের কর্ম নয়। জীবন-বীণার নিগূঢ় তারে অন্তরের সূক্ষ্মতম অনুভবকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় দরবারি কানাড়ার মীড়-মূর্ছনা চলছে, সেখানে কাহারবা তালের চাকাইকা-চাক্‌চুম্ ছন্দে যারা সহজে মত্ত হয় তাদের এনে বসিয়ে দিলে তারা খুশী হবে কেন? শুধু পেলেই ত হয় না, গ্রহণ করবার শক্তি থাকা চাই।"

কৃষ্ণধন বললেন, "বটেই ত। গ্রহণ করবার শক্তি না থাকলে দেওয়া-নেওয়ার উভয় কারবারই পণ্ড।"

বললাম, "ঠিক বলেছ। কৌতুকরসের কথাই ধর না কেন কৌতুকরস সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট রস। এ রস ভারি কঠিন পাকের রস; হ'ল ত হ'ল, নইলে একেবারে ধোঁয়াটে গন্ধ। করুণ-রসের কারবারে তবু খানিকটা ইনিয়ে-বিনিয়ে শেষ পর্যন্ত একটু হয়ত চোখের জল ফেলানো যায়; হাস্যরসের কারবারে প্রথম

ঘর্ষণেই জ্বলল ত জ্বলল, নইলে একেবারেই নিবল! অবসিকদের স্থূল রসবোধে সূক্ষ্ম কৌতুক-শিল্প অনধিগম্য বস্তু। যতদিন থেকে রসের কারবার চলছে, ততদিন থেকেই এই অরসিকের দলও চলে আসছে। তাই বহু পূর্বকালে কোন কবি ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে বলেছিলেন, হে বিধাতা, তুমি আমাকে অন্য দুঃখ যত ইচ্ছা দাও, কিন্তু, অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ—অরসিকের কাছে রস-নিবেদনের দুঃখ কপালে লিখো না। তাই ব'লে অরসিকদের খাতিরে সাহিত্য থেকে সরস রসের কারবার বাদ দেওয়াও ত যায় না। তাই বলছিলাম, সব সাহিত্যই সব পাঠকের জন্য নয়।

অবশ্য, প্রচারধর্মী যে সাহিত্য, যে সাহিত্য শুদ্ধ সাহিত্য নয়, মিশ্র সাহিত্য ; অর্থাৎ, যে সাহিত্য নিজে বিগ্রহ নয়, কোনো প্রকার গণ-আন্দোলনের বাহক, তা সে গণ-আন্দোলন রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অথবা যে-কোনো নীতিরই হোক না কেন,—সে সাহিত্য রচনা করতে হ'লে জনতার মুখের দিকে খানিকটা চাইতেই হয়। কিন্তু যে কথা-সাহিত্যে উদ্দেশ্যের কণ্টক প্রবেশ করলে, তা সাহিত্যের মল্লিকা হতে পারবে না, শক্তিশালী লেখনীর গুণে গোলাপ হয়ত হতে পারে।"

কৃষ্ণধন বলেন, "কিন্তু নারায়ণবাবুর এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপনার সামগ্রিক মত কি দাদা? আমি ত মোটামুটি ওঁর প্রতিপাদ্য সমর্থন করি।"

বললাম, "আমিও করি। তবে সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে উনি যা বলেছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে। সে কথা শুরু করবার আগে একটু জল খেয়ে নিই।"

টেবিলের উপর জলের গ্লাসে জল রাখাই ছিল। খানিকটা পান ক'রে কৃষ্ণধনের হাত থেকে ১৩৬২ সালের আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি' নিয়ে শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর লিখিত "প্রসঙ্গ কথা"য় চোখ বুলোতে আরম্ভ করলাম।

কৃষ্ণধন বললেন, "লেখকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নারায়ণবাবু যেখানে বলেছেন, সেইখানটা চাচ্ছেন ত ?"

বললাম, "সেইখানটাই চাচ্ছি।"

আমার দিকে হস্ত প্রসারিত ক'রে কৃষ্ণধন বললেন, "দিন, বের ক'রে দিই।"

বললাম, "পেয়েছি। আর তোমার সাহায্যের দরকার হবে না।" তারপর খানিকটা প'ড়ে নিয়ে বললাম, "লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য সম্বন্ধে নারায়ণবাবু ঠিক কি বলতে চেয়েছেন, তা বুঝতে প্রথমে একটু গোল লাগে। তিনি যখন তাঁর বক্তব্যের সূত্রপাত করলেন, 'কেউ কেউ বলবেন, রচনার বিষয় নির্বাচনে লেখকের অভিজ্ঞতা একটি বড় জিনিস' ব'লে, তখন মনে হ'ল সে কথা 'কেউ-কেউ'ই বলবেন, তিনি নিজে বলবেন না। কিন্তু তাঁর পরবর্তী মন্তব্যগুলি থেকে বোঝা যায় তিনিও সেই কথাই বলেন। এমন কি, তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, 'স্বধর্মে ( প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ) সংস্থিত থেকে বরং অপযশ কুড়োনো ভাল তবু পরধর্ম ( অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ) ভয়াবহ।...যিনি যে অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অংশভাক্ নন তাঁর পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা চিত্রিত করতে যাওয়া সঙ্গত নয়, শোভনও নয়।...' ইত্যাদি।

আমার মতে, লেখকের পক্ষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটা বড় ম্‌ল্য নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু তাই ব'লে সেটা এত বড় নয় যে, একজন শক্তিহীন, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের সমুদ্র-ঝটিকার অপযশস্কর বর্ণনা বরং ভাল, কিন্তু একজন শক্তিমান কিন্তু সমুদ্র-ঝটিকা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাবিহীন লেখকের সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমুদ্র-ঝটিকার বর্ণনা 'ভয়াবহ',—অর্থাৎ বর্জনীয়।

সাধাবণ অভিজ্ঞতা বলতে যে জিনিস আমি বোঝাতে চাই তা আমাদের সকলেরই অল্প-বিস্তর আছে যা আমরা আমাদের প্রয়োগ-কৌশলের তারতম্য অনুযায়ী কাজে লাগিয়ে থাকি। এই চোখে-না-দেখা সাধাবণ অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি কানে শুনে, খবর নিয়ে, বিবরণ প'ড়ে, ম্যাপ দেখে, আরও বহুলপরিমাণে অনুমানের দ্বারা। প্রতিভাবান লেখকের কাছে সুচিন্তিত অনুমান এমন একটা সক্রিয় ফলপ্রদ বস্তু যা অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাল্লা দেয়; এমন কি, তাকে অতিক্রম ক'রেও যায়। তুমি কখনো নৌকো ক'রে পদ্মা নদী পার হবার সময়ে দুরন্ত ঝড়ে পড়েছ?"

মাথা নেড়ে কৃষ্ণধন বললেন, "না, তা পড়ি নি।"

বললাম, "না পড়ারই কথা। পশ্চিম-বাংলায় বর্ধমান অঞ্চলে বাড়ি, সাধারণত কলকাতায় বাস কর, সুতরাং তোমার জীবনযাত্রায় পদ্মা নদী, নৌকো এবং ঝড়—এই তিন বস্তুর একত্র সংযোগের সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তিন বস্তু সম্বন্ধে তোমার যে সাধারণ জ্ঞান আছে, তার ওপর সামান্য কিছু তথ্য সংগ্রহ ক'রে তুমি যদি তোমার সাহিত্যিক প্রতিভা প্রয়োগ ক'রে পদ্মা নদীতে

নৌকোর ওপর দুরন্ত ঝটিকার বর্ণনা কর, আমার বিশ্বাস, পদ্মা নদীতে নৌকোয় পার হবার সময়ে ঝড়ের মুখে যারা পড়েছে, তারা তোমার ঝড়ের বর্ণনা প'ড়ে হয়ত মনে করবে, 'তাই ত। সেদিনের ঝড়ের এই অপূর্ব রুদ্রমূর্তি সেদিন ত চোখে পড়ে নি, কিন্তু আজ কৃষ্ণধনবাবুর লেখার মধ্য দিয়ে পড়ছে!'...বল, ঠিক কি-না?"

স্মিতমুখে কুণ্ঠিত স্বরে কৃষ্ণধন বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু অনভিজ্ঞতার সাধারণ মাটি দিয়ে তেমন মনোহর পুতুল গড়বার অসাধারণ শক্তি যদি থাকে, তবেই ঠিক।"

উত্তরে আমি বললাম, "সে অসাধারণ শক্তি আছে ধ'রে নিয়েই কথা বলছি। তা যদি না থাকে তা হ'লে ত অভিজ্ঞতার মাটি দিয়েও নর গড়তে বানর গড়বার আশঙ্কা থাকে। অবশ্য লেখক যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে সাধারণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে সাহিত্য রচনা করেন, তাঁকে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ক'রে চলতে হয়। ভুল যদি তিনি একান্তই করেন তা হ'লে error of omission করলে বরং চলবে, কিন্তু error of commission কিছুতেই চলবে না। অর্থাৎ যে-সকল বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তার মধ্যে কিছু বাদ পড়লে চলবে; কিন্তু যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই তাকে টেনে এনে বসালে কিছুতেই চলবে না।"

কৃষ্ণধন জিজ্ঞাসা করলেন, "যেমন?"

বললাম, "যেমন ধর, এমন একটা স্থানের বিবরণ দিচ্ছ যার মাটিতে পলাশ গাছ জন্মায় কিন্তু তমাল গাছ জন্মায় না। সে স্থানের বিবরণে পলাশ গাছ বাদ পড়লে error of omission হয়ে তেমন ভুল হয়ত হবে না; কিন্তু সে বিবরণে তমাল গাছ বসালে error

of commission-এর মারাত্মক ভুল হবে। এ বিষয়ে একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত দিই।

বহুদিনের কথা। তখন 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে আমার 'অভিজ্ঞান' উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে। সুসাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস 'অভিজ্ঞান' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সদা-সর্বদা আমাকে লিখে লিখে জানাতেন। যখন উপন্যাসের ঘটনাবলি ঘাটশীলা-গালুডি অঞ্চলে চলছে, তখন তিনি ঝাড়গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট। সে সময়ে তিনি লিখেছিলেন, আমার দেওয়া ও-অঞ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা পাঠ ক'রে তিনি বুঝেছিলেন যে, ও-অঞ্চলের প্রতি তরু-গুল্ম-লতার সহিত আমার নিবিড় পরিচয় ছিল। অথচ ঘটনা হচ্ছে, একমাত্র ট্রেনে, তাও রাত্রিকালে, ও-অঞ্চল দিয়ে যাওয়া ছাড়া আজ পর্যন্ত ও-অঞ্চলের কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই। · তবে আমি কিরূপে সুধাংশুকুমারের মতো একজন বুদ্ধিমান এবং সতর্ক ব্যক্তির মনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম ?

তার জন্যে আমাকে গালুডি অঞ্চলের অধিবাসী এবং অভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তির নিকট হতে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ও-অঞ্চলে ভূমি সাধারণত সমতল অথবা উচ্চাবচ; মৃত্তিকার রঙ কালচে, লালচে অথবা তামাটে; নদী-গিরি-অরণ্যের রূপ কি প্রকার; তৃণ-কণ্টক-লতা-গুল্ম কি ধরনের; বন-জঙ্গল ঝোপ-ঝাড়ের বিশেষত্ব কোথায়; দ্রুম-পাদপের মধ্যে প্রধান এবং বিশেষভাবে স্থানীয় কোন্‌গুলি—এই ধরনের অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অবশ্য সবগুলিরই ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ বিশেষ কতকগুলি উপকরণ নিপুণতার

সহিত নির্বাচিত ক'রে নিয়ে লাগাতে পারলে শূন্য স্থানগুলি পাঠক-চক্ষুর সামনে আপনা-আপনিই ভরাট হয়ে যায়।

সাহিত্য ইঙ্গিতময় বস্তু। সাহিত্যিক ইঙ্গিত ছাড়েন একটি; পাঠকের চিত্তে তা প্রবেশ করে চতুর্গুণ হয়ে। দক্ষিণা ঝড়ের বর্ণনার মধ্যে সাহিত্যিক হয়ত ঈষৎ রসাত্মক ক'রে লিখলেন, 'ঝড়ের দাপট হতে রক্ষা পাবার জন্যে তাল ও নারিকেল বৃক্ষগুলি যেন হিমালয়ের দিকে নত-প্রসারিত মস্তকে শোঁ-শোঁ রবে তাদের ব্যগ্র প্রার্থনা জানাচ্ছে,'—অমনি পাঠকের কল্পনাকুশল পরিপূরণশীল চিত্তে ঝড়ের একটি পরিপূর্ণ চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠে কারখানার চিমনির ধোঁয়া চিমনি হতে বেরিয়ে এক ইঞ্চিও উপর দিকে না উঠে ছিন্নবস্ত্র পাগলের ন্যায় সোজা উত্তরমুখে ধাবিত হয়; অতর্কিতে ঝাপট-খাওয়া পাখীরা আশ্রয়তরুর উদ্দেশ্যে পাখা বন্ধ ক'রে পেটের মধ্যে পা ঢুকিয়ে সজোরে-নিক্ষিপ্ত জড়পদার্থের মতো দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে ছুটে চলে; এমন কি, পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় দয়িত-অপেক্ষারত উদ্বিগ্ন নায়িকার বাম কপালের চূর্ণকুন্তল বারংবার মুখের উপর এসে প'ড়ে দৃষ্টি বিঘ্নিত করতে থাকে। এইরূপে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা প্রসন্ন সহযোগিতার কারবার আরম্ভ হয়। লেখক ইঙ্গিত করেন খানিকটা, পাঠক পূরণ করেন অনেকটা।

বিস্তৃত উচ্চাবচ ভূমি, দিগন্তধূসর গিরিমালা, একটি পার্বত্য নদী, কয়েকটি শাল পলাশ ও মহুয়া গাছ এবং মনসাকাঁটার কিছু ঝোপ-ঝাড় সম্বল ক'রে একজন শিল্পকুশল লেখক সাঁওতাল পরগনার একটি সার্থক পরিবেশ অনায়াসে রচিত করতে পারেন।

তার জন্য তাঁর সেখানকার তৃণ-গুল্ম-লতার সুবিস্তৃত খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত না হ'লেও চলে।

জাহাজে বঙ্গোপসাগর পার হবার সময়ে শরৎচন্দ্র সত্যি-সত্যিই কখনো দুরন্ত সাইক্লোনের মধ্যে পড়েছিলেন কি-না জানি নে; হয়ত পড়েছিলেন, হয়ত পড়েন নি। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে তিনি সমুদ্র-বক্ষে সাইক্লোনের যে ভীষণ-সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন, যদি জানতে পারি তা তাঁর সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং অসাধারণ প্রতিভার বলে তিলকে তাল ক'রে করেছেন, এমন কি শূন্যকেই তাল ক'রে করেছেন, তা হ'লে বিস্মিত হব না, দুঃখিতও হব না। ভবিষ্যতে যদি কোনো শক্তিমান্ লেখক তাঁর লেখার মধ্যে প্রয়োজনকালে জাহাজে সাইক্লোন ঝড়ের শরৎচন্দ্রের সাইক্লোন-বর্ণনা হতে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়কে ভিত্তি ক'রে এবং তার উপর নিজে কিছু নূতন রঙ ফলিয়ে সাইক্লোনের চিত্র অঙ্কিত করেন, তা হ'লে তাঁকেও দোষ দোব না। গ্রন্থপাঠের দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার একটা প্রধান উপায়।

পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে যে কথা, চরিত্র সৃষ্টি বিষয়ে বোধ হয় তা আরও বেশি মাত্রায় বলা চলে।"

কিন্তু রাত হয়ে এসেছে, কৃষ্ণধনকে পাঁচু খানসামা লেনে যেতে হবে। বললাম, "আজ না-হয় এইখানেই আমাদের আলোচনার ইতি করা যাক। তোমাকে আবার অনেক দূরে যেতে হবে।"

পূর্বদিকের দেওয়ালে বিলম্বিত ক্লকের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কৃষ্ণধন বললেন, "সাড়ে আটটা বেজেছে, যদি আপনার অসুবিধে না হয়, নটা পর্যন্ত বসা যেতে পারে।"

বললাম, "বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে নটা পর্যন্ত বসলে

তোমার যদি অসুবিধে না হয়, বাড়িতে অবস্থান ক'রে নটা পর্যন্ত বসলে আমার অসুবিধে হওয়া উচিত হবে না।"

কৃষ্ণধন বললেন, "তা হ'লে চরিত্র সৃষ্টি বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনার মতামত একটু শোনা যাক।"

বললাম, "পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ে নজির তুলেছি আমার নিজের উপন্যাস 'অভিজ্ঞান' থেকে ; চরিত্র সৃষ্টি বিষয়েও যদি সেই কাজ করি আমার অন্য এক উপন্যাস থেকে, তা হ'লে আত্মচারিতার অসৌজন্য যদি কিছু হয়, ক্ষমা ক'রো। কিন্তু নিজের প্রতিপাদ্য প্রতিপন্ন করতে ব'সে নিজের বাক্স থেকে দলিল বার করার রীতিও ত প্রচলিত আছে কৃষ্ণধন !"

হাসিমুখে কৃষ্ণধন বললেন, "অকাট্য।"

বললাম, "আমার 'অমলা' উপন্যাসে প্রমথ নামে এক দুর্বৃত্তের চরিত্র অঙ্কিত করেছি। 'অমলা' প'ড়ে কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার সুসাহিত্যিক শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছিলেন, 'আমি, বিলিতী এবং কন্টিনেণ্টাল্ অনেক উপন্যাস পড়েছি, কিন্তু প্রমথর মতো এমন একজন perfect villain ও knave-এর সাক্ষাৎ কোথাও পাই নি।'···কিন্তু আত্মশ্লাঘা করছি নে কৃষ্ণধন, এ কথা আমার অতি-বড় শত্রুও স্বীকার করবে যে, villainy ব্যাপারে আমি প্রমথর শত যোজন পশ্চাতে প'ড়ে আছি। তা ছাড়া বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজনের মধ্যেও প্রমথর মতো দুর্বৃত্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নেই। প্রমথ চরিত্র আমি সৃষ্টি করেছি স্রেফ কল্পনা আর অনুমানের সাহায্যে।

কল্পনা আর অনুমানের সাহায্যে শুধু প্রমথদেরই অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, জগতের বহু বড় বড় তথ্য এবং সত্যেরও সন্ধান

পাওয়া গেছে ঐ দুটি উপায়ের সাহায্যে। যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণের তালিকায় অনুমানের স্থান আছে। নিশ্চয়ের হেতু হচ্ছে চারটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ।

আইনশাস্ত্রেও highly probable ও highly improbable ব'লে দুটি স্বীকৃতি আছে যার উপব নির্ভর ক'বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডও দেওয়া যায়, মুক্তিও দেওয়া চলে। কথাসাহিত্যেও highly probable-এর মতো একটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতির দ্বারা আমি প্রমথকে দুর্ভাবনার highly probable-এর বাস্তবতার স্তরে নিয়ে গেছি। অনুমান সেখানে অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে, এমন কি হয়ত অতিক্রমও করেছে। অতিক্রম যদি ক রে থাকে তাতে ক্ষতি হয় নি, কারণ কথাশিল্প জীবনের প্রতিচ্ছবি—কিন্তু একেবারে প্রতিদিনকাব সাদামাটা বাস্তব জীবন নয়। ফোটো-গ্রাফের সঙ্গে আলেখ্যর যে প্রভেদ, জীবনের সঙ্গে কথাশিল্পের ঠিক সেই প্রভেদ। এ বিষয়ে আনাতোল ফ্রাঁস তাঁর Garden of Epicurus গ্রন্থে বলেছেন, "Truth is not the objective of Art. It is the sciences we must appeal to for that, as it is what they aim at ; not to literature, which has, and can have, no objective but beauty. * * * If we are to have a really pretty story, the bounds of everyday experience and usage must needs be a little overstepped." চক্ষুর চেয়ে চিন্তা কম ক্রিয়াশীল পদার্থ নয়। তাই জীবনে অনেক Yarrow Visited অপেক্ষা অনেক Yarrow Unvisited আমাদের মনোরঞ্জন করে অনেক বেশি।"

কৃষ্ণধন বললেন, "কিন্তু দাদা, নারায়ণবাবু ত কল্পনা আর মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির মূল্যও স্বীকার করেছেন।"

বললাম, "করেছেন। সেইজন্যে অভিজ্ঞতা আর কল্পনা—উভয় সম্বন্ধেই তাঁর সঙ্গে আমার অনৈক্য মতের ততটা নয়, যতটা মাত্রার।"

এইখান থেকে আলোচনা মোড় নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে পড়ল।

মিনিট দশেক পরে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে কৃষ্ণধন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "নটা বাজতে পাঁচ মিনিট। আজ তা হ'লে চলি।"

বললাম, "এস।"

## ১৫

রবিবার। অন্তত ছুটির বার।

বৈঠকখানায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ছি, পূর্ব দিকের পর্দাটা একটু নড়ল। চেয়ে দেখি, দুটি মেয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি মারছে।

চোখোচোখি হতে একটি মেয়ে বললে, "আসতে পারি ?"

বললাম, "অনায়াসে। ঐ পর্দাটুকু ছাড়া আর কোনো বাধা নেই।"

স্মিতসলজ্জ মুখে মেয়ে দুটি ঘরে প্রবেশ করল।

আমি ব'সে ছিলাম ফরাসে। সামনের ডবল চেয়ারের আসন দেখিয়ে বললাম, "বসুন।"

আমার নির্দেশ অনুযায়ী মেয়ে দুটি পাশাপাশি উপবেশন করল। তারপর কুণ্ঠিত স্বরে প্রথমা মেয়েটি বললে, "আমাদের 'আপনি' বলবেন না ; অনুগ্রহ ক'রে 'তুমি' বলবেন।"

এ ত বহুবার-শ্রুত মামুলি অনুরোধ। বললাম, "আচ্ছা, তাই বলব। তোমাদের নাম কি ?"

প্রথমা তার নিজের এবং তার সঙ্গিনীর দুটি নামই বললে। এত দিনের ব্যবধানে নাম দুটি ভুলে গেছি। সুবিধার জন্য ধরা যাক, প্রথমা মেয়েটির নাম মালতী, দ্বিতীয়াটির মল্লিকা।

মল্লিকা এ পর্যন্ত মুখ থেকে একটিও শব্দ নিঃসৃত করে নি ; চোখোচোখি হ'লে হয় নিম্ন দিকে, নয় এক পাশে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে। অনুমান করলাম, মেয়েটি হয় অতিমাত্রায় লাজুক, নয়,

আমার কাছে কোন কিছুর সাহায্যপ্রার্থিনী; বলিষ্ঠতর স্নায়ুর মালতী তার পৃষ্ঠপোষিকা।

অনুমানে আমার ভুল হয় নি অবিলম্বেই তা বুঝলাম। মল্লিকার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "মল্লিকা, তোমরা এসেছ শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে, না, কাজের কথাও কিছু আছে?"

লক্ষ্য করলাম, মল্লিকার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠেছে। অপাঙ্গে মালতীর প্রতি একবার চেয়ে দেখে আমার প্রতি মুহূর্তের জন্য সলজ্জভীরু দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললে, "আসলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

মালতী বললে, "কাজের কথাও একটু আছে।"

বললাম, "তা হ'লে কাজের কথাটা আগে সেরে ফেল। ছুটির দিন, অনেকেই আসেন। কেউ এসে পড়লে অসুবিধা হবে।"

মালতী বললে, "মল্লিকা কবিতা আর গল্প দু-ই লেখে। আমাদের পাড়ার হাতের লেখা মাসিক পত্রের সম্পাদক মল্লিকার লেখা খুব পছন্দ করেন। ও একটি গল্প আপনাকে দেখাবার জন্যে এনেছে। ছোটগল্প—পড়তে দশ-বারো মিনিটের বেশি লাগবে না। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে দেখে আপনার মতামত একটু জানান।"

বললাম, "নিশ্চয়ই জানাব। কই, দেখি তোমার লেখা!" ব'লে মল্লিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম।

ব্যাগ থেকে লেখাটি বার ক'রে মল্লিকা মালতীর হাতে দিতে গেল। বোধ হয় এতখানি পরনির্ভরতায় ঈষৎ বিরক্ত হয়ে মৃদু তিরস্কার করলে মালতী, "তুই নিজে দে না।"

কম্পিত হস্তে আরক্তমুখে মল্লিকা তার রচনাটি আমার হাতে দিলে।

অবস্থা দেখে মায়া হ'ল। নিতান্ত নরম মেরুবৃন্তের মল্লিকা ফুল। আমার কাছে ত অনেক মেয়েই আসে, কিন্তু এমন একটি সলজ্জ স্নিগ্ধ অপ্রতিভ মেয়ে কদাচিৎ আসে। উদ্বিগ্ন হলাম পাছে গল্পটা পড়ার পর মেয়েটিকে আঘাত দিতে বাধ্য হতে হয়।

গল্প শেষ করতে মিনিট দশেকের বেশি লাগল না। যতক্ষণ গল্প পড়ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমার মুখে খুশি-অখুশির ভাষ্য পাঠ করবার আগ্রহে মেয়ে দুটি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

লেখাটি মল্লিকার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "তোমার গল্পটি ঠিক যেন এমন একটি সন্দেশ যার টাটকা ছানার মিষ্টি মৃদু সৌরভে মন উল্লসিত হয়, কিন্তু সমস্ত জিনিসটাকে উৎকৃষ্ট সন্দেশ ব'লে মানা চলে না। ছানা তোমার ভাল, কিন্তু সন্দেশ বানাবার যথার্থ পাকটুকু এখনও তোমার আয়ত্তে আসে নি। আমি যা বলছি বুঝতে পারছ মল্লিকা ?" মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি বুঝতে পারছ মালতী ?"

দুজনেই ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ; কথায় কেউ উত্তর দিলে না। বুঝলাম, সন্দেশের রূপকে আবৃত আমার মন্তব্যের ষোল আনা মর্মগ্রহণ করতে তারা সমর্থ হয় নি। তবে রূপকের মধ্যে ছানার অংশটুকু যে প্রশংসার দ্যোতক, এটুকু দুজনেই বুঝেছে।

মল্লিকার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "আমার কথা শুনে দুঃখিত হও নি ত মল্লিকা ?"

ঘাড় নেড়ে হাসিমুখে মল্লিকা বললে, "না।"

"খুশী হয়েছ ?"

"হয়েছি।"

বললাম, "হওয়াই উচিত। তোমার ভাষাটি চমৎকার ; কিন্তু

ঘটনার উপকরণ দিয়ে গল্প বাঁধবার কৌশল এখনো আয়ত্ত হয় নি। তোমার ভাষা হচ্ছে ছানা, আর গল্প বাঁধবার কৌশল সন্দেশের পাক। গল্প বাঁধতে বাঁধতেই গল্প বাঁধার কৌশল আয়ত্ত হবে।… এ গল্পটি কতদিন হ'ল লিখেছ?"

মল্লিকা বললে, "পাঁচ-ছ দিন হবে।"

বললাম, "না, এ কাজ কখনও ক'রো না। তোমার এটা সাধনার কাল—এ সময়ে লেখা লিখে অন্তত মাস ছয়েক বাক্সবন্ধ ক'রে রেখে দেবে। তারপর যখন বাক্স খুলে পড়বে তখন তার মধ্যে নিজেই কত ভুল-ভ্রান্তি, কত ত্রুটি-বিচ্যুতি, কত অভাব-আতিশয্য দেখতে পাবে। শেখবার এর চেয়ে ভাল উপায় আর-কিছু নেই। সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে সাধনা করতেই হবে। ভগবানকে পেতে হ'লে সাধনা ভিন্ন উপায় নেই; কণ্ঠ সুরেলা করতে হ'লে গলা সাধতে হয়, এমন কি, বাঁদরের হাত থেকে অপহৃত জিনিস উদ্ধার করতে হ'লে কলা দেখিয়ে সেই সাধাসাধিই করতে হয়।"

শেষোক্ত দৃষ্টান্তের ঔৎকট্যে মেয়ে দুটি মৃদুস্বরে হেসে উঠল।

বললাম, "কিন্তু কলা দেখিয়ে সাহিত্য-লক্ষ্মীর হাত থেকে কোন কিছুই পাওয়া যায় না। তার জন্যে চাই তপস্যা—শব্দের তপস্যা, বাক্যের তপস্যা, অনুচ্ছেদের তপস্যা। সেই তপস্যার সময়কে তোমরা অবহেলা ক'রো না।"

পথে গাড়ি থামার এবং গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লালী কুকুর তারস্বরে চিৎকার করতে করতে অনধিকার-প্রবেশকারী দুশমনের পথ রোধ করতে ছুটল। সদর-দরজা ঠেলার শব্দ হতে লালীর তারস্বর তারতর হ'য়ে

উঠল; কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আস্ফালনের সেই উচ্চস্বর স্তিমিত হয়ে গেল। বুঝলাম, নবাগতকে দেখে লালী বুঝেছে—দুশমন নয়, দোস্ত।

পর-মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলেন শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়সে আমার চেয়ে অন্তত বাইশ-তেইশ বৎসরের কনিষ্ঠ, কিন্তু অন্তরঙ্গতায় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার নিকট এঁর গৌণ পরিচয়—ইনি একজন উচ্চস্তরের সরকারী কর্মচারী, দামোদব ভ্যালি করপোরেশনের ফাইন্যানশিয়াল অ্যাড্‌ভাইসার। মুখ্য পরিচয়—ইনি একজন নিপুণ সাহিত্যিক, যাঁর লেখনী কবিতা গল্প এবং প্রবন্ধ—তিন ক্ষেত্রেই সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে চলে। আমার প্রতি এঁর এত অনুরাগ যে, কলকাতায় উপস্থিত থাকলে, নিতান্ত কোনো বাধা না ঘটলে, রবিবারে কিংবা ছুটির দিনে একবার আমাকে দর্শন না দিয়ে যান না।

মেয়ে দুটিকে দেখে সুধাংশুবাবু আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "আমি বোধ হয় আপনাদের কথাবার্তায় বিঘ্ন ঘটালাম। একটু না-হয় ঘুরে আসি।"

আমি বললাম "কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটান নি। এঁদের সঙ্গে কাজের যে কথা ছিল তা হয়ে গেছে। এখন এঁদের কাজ হবে ব'সে ব'সে আমাদের আলাপ-আলোচনা শোনা। আপনি জমিয়ে বসুন।"

আমার কথা শুনে মেয়ে দুটি পরস্পরের মধ্যে কি বলাবলি ক'রে উঠে দাঁড়াল। মালতী বললে, "এখন তা হ'লে আমরা আসি।"

বললাম, "আচ্ছা, এসো।" পর-মুহূর্তে বললাম, "কিন্তু এসো মানে—শুধু 'যাও' নয়, 'এসো' মানে 'আবার এসো'ও।"

মেয়ে দুটির মুখে মৃদু-হাস্য ফুটে উঠল। আমাদের দুজনকে অভিবাদন জানিয়ে তারা প্রস্থান করলে।

সুধাংশুবাবু বললেন, "খুব ত মাদ্রাজে নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন ক'রে এলেন।"

সে দিন ১৯৫৬ সনের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশনের দিন আষ্টেক পরে, অর্থাৎ ১০ই জানুয়ারি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরেছি।

বললাম, "হ্যাঁ, ভালই ক'রে আসা গেল। ওখানকার বাঙালী প্রবাসী এবং তামিল-তেলেগু অধিবাসীদের সমবেত যত্ন এবং আগ্রহে যে ব্যাপারটা হ'ল, তাকে একান্তই যদি রাজসূয় না বলি, রাজকীয় নিশ্চয় বলা চলে। এক হিসাবে রাজসূয়ও বলা চলে। সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের পদ-প্রক্ষালনের ভার নিয়েছিলেন; আর বঙ্গসাহিত্যের যজ্ঞে মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণ যজ্ঞের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অতিথি-অভ্যাগতদের বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল মাদ্রাজের অভিজাত অঞ্চল মাউণ্ট রোডের এয়ার লাইন্‌স্ হোটেল ও সরকারী অ্যাসেম্‌ব্লি-হোস্টেল—দুটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায়।"

সুধাংশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমি ছিলাম ১২ নং স্টার্লিং রোডে ইনকাম-ট্যাক্সের কমিশনার শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে। প্রিয়নাথ ছিলেন মাদ্রাজ সম্মেলন-মহাযজ্ঞের বোধ হয় প্রধান হোতা। আমি ছাড়া তাঁর গৃহে আরও দুজন উঠেছিলেন—আমার বৈবাহিক শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ।"

"আপনার সাহিত্য-সভাপতির অভিভাষণ বোধ হয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে পড়া হয়েছিল ?"

"হ্যাঁ, দ্বিতীয় দিনে, ১লা জানুয়ারির সকাল সাড়ে আটটার সময়ে। আপনারা কিন্তু কলকাতায় সেই দিনই ঘণ্টা দেড়েক আগে খবরের কাগজে আমার ভাষণ প'ড়ে শেষ করেছিলেন। এমন কি খোদ মাদ্রাজ শহরে বেলা দুটো আড়াইটের সময়ে প্লেনে যে খবরের কাগজ পৌঁছেছিল তাতেও আমার ভাষণ প্রকাশিত হয়েছিল। খবরের কাগজের মালিকদের এই অতিতৎপরতায় সম্মেলনের কর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের সভায় ভাষণ পড়া হবার আগে আর কোথাও জনসাধারণের মধ্যে তা প্রকাশিত হওয়া তাঁরা পছন্দ করেন নি।"

সহাস্যমুখে সুধাংশুবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সাংবাদিকদের অতিতৎপরতা বিশিষ্ট ব্যক্তির মারা যাবার পূর্বেই মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করেছে, এমন কথাও শোনা গেছে।···মাদ্রাজ আপনার লাগল কেমন ?"

বললাম, "ভাল। শহরের অঙ্গে কতকটা-অপরিচিত একটা নূতন শ্রী দেখে ভারি ভাল লেগেছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বল্পায়তন, পথে যান-বাহন-জনতার অবাঞ্ছনীয় উপদ্রব নেই, গাছ-পালা লতা-পল্লবের একটু আধিক্যের সমারোহে স্নিগ্ধ। উত্তর-ভারতের বড় বড় শহরগুলি থেকে কোথায় যেন গোত্রগত একটু পার্থক্য আছে। সঙ্গীতের ভাষায় কাশী কলকাতা লক্ষ্ণৌকে যদি ভৈরব টোড়ি কানাড়া বলি, তা হ'লে মাদ্রাজকে বলব সুমিষ্ট তিলক কামোদ।"

আমার মাদ্রাজ-প্রশস্তি শুনে সুধাংশুবাবু পুলকিত হয়ে হাসতে লাগলেন ; বললেন, "মাদ্রাজে আর কি ভাল লাগল ?"

"আর ভাল লাগল মাদ্রাজের সমুদ্র। প্রথম দিনই সভায় যাবার পথে সমুদ্র-সৈকতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গিয়েছিলাম। দূর থেকে 'লবণাম্বুরাশি' হঠাৎ দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে আনন্দে অপলক হয়ে গেলাম। বর্ণের এ কি অপূর্ব শোভা! মনে হ'ল, যেন এক-সাগর ব্লু-ব্ল্যাক কালি বিস্তৃত স্থান জুড়ে থৈ-থৈ করছে। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পুরীর সমুদ্র অবশ্য অপরূপ; কিন্তু তার লীলাচঞ্চল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে মাদ্রাজ-সমুদ্রের নিবিড়-গভীর নীলত্ব নেই।"

"মাদ্রাজের বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন?"

"এক পা-ও না। ঝটিকাবেগে দেখে-শুনে বেড়াবার বয়সও নেই, মনও নেই। দিন কয়েক যা ছিলাম, মাদ্রাজ নগরকে যতটা পারি ভাল ক'রে দেখেছি। সাগর-উপকূলে তিন দিন কাটিয়েছি, মাদ্রাজ শহরের এলাকায় অবস্থিত একটি মন্দির আর তার গোপুরম্ দেখেছি। মন্দির অবশ্য এমন কিছু নয়, কিন্তু মন্দিরের তুলনায় গোপুরম্‌টি অনেক উচ্চ স্তরের; পৌরাণিক কাহিনীর অপরূপ কারুকার্যে খচিত। আর খুশী হয়েছি অন্ধ্র আর মাদ্রাজ প্রদেশের অধিবাসীদের দেখে-শুনে, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে। এমন একটি বলিষ্ঠ, কর্মঠ, মেধাবী জাতি ভারতে বিরল। আমার বিশ্বাস, এমন একদিন আসবে যেদিন উত্তর-ভারতের উপর দক্ষিণ-ভারত আধিপত্য ফলাবে।"

"বাঙালীদের প্রতি তাদের কেমন মনোভাব দেখলেন?"

"খুব ভাল। সভা সমিতি সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাঙালী জাতির যা প্রশস্তি গাইতেন তা গলাধঃকরণ করতে আমাদের একটু কষ্ট বোধ হ'ত। অবশ্য সভা-সমিতিতে সাধারণত সকলেই একটু ফলাও ক'রে কথাবার্তা ব'লে থাকেন। কিন্তু আমি মাদ্রাজের

ইন্‌কাম-ট্যাক্স কমিশনারের গৃহে ছিলাম ব'লে প্রত্যহ সকাল-বিকালে বহু স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হবার আর আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ হ'ত। তা থেকে বাঙালী জাতির প্রতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের গভীর আসক্তির পরিচয় পেতাম। তাঁরা বলতেন, এখনও তাঁরা আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্যে বাংলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের, বিশেষত শরৎচন্দ্রের, গ্রন্থের অনুবাদ তাঁদের ঘরে ঘরে যে-পরিমাণে প্রবেশ করেছে এমন আর ভারতের অন্য কোনও দেশের লেখকের বই করে নি।"

সুধাংশুবাবু বললেন, "বাংলার প্রতি দাক্ষিণাত্যের এই অনুরাগের মূলে সুদূরকালের চৈতন্যদেব হতে আধুনিক কালের বাংলার চারজন মনস্বী সন্তান—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিহিত আছে।"

বললাম, "সে কথা একান্তভাবে সত্য। শ্রী কে. শ্রীনিবাসন নামে আমার এক পরিচিত কলকাতাবাসী মাদ্রাজী ভদ্রলোকের মতে বাংলার সহিত দাক্ষিণাত্যের অনেক বিষয়ে বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। সুদূর অতীতে দ্রাবিড় ও বাংলার মধ্যে গোত্রগত কোনও যোগাযোগ হয়ত এই সাদৃশ্যের জন্য দায়ী। সে যাই হোক না কেন, ভবিষ্যতে যদি একদিন কুমারিকা অন্তরীপ হতে আরম্ভ ক'রে হিমালয়ের দার্জিলিং পর্যন্ত ভারতের একটানা পূর্ব ভূভাগ একটি সমতান্ত্রিক সুসংযুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়, বিস্মিত হব না।"

মাদ্রাজ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনার পর সুধাংশুবাবু

বললেন, "আর কয়েকদিন পরে ত আপনি ক্যালক্যাটা ইউনিভার্সিটি থেকে জগত্তারিণী পদক পাচ্ছেন।"

বললাম, "পাচ্ছি ব'লে বিশ্বাস করি। কিন্তু বিশ্বাস করবার আগে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে যে কাণ্ড ক'রে এসেছি, তা শুনলে পুলকিত হবেন।"

সহাস্যমুখে ঔৎসুক্যের সহিত সুধাংশুবাবু বললেন, "কি রকম ?"

বললাম, "বলছি। তার আগে দু মিনিটের জন্যে একবার ভেতর থেকে ঘুরে আসি!"

ব্যস্ত হয়ে সুধাংশুবাবু বললেন, "চা বলতে যাচ্ছেন ত ? না না, আর চা খাব না ; সকাল থেকে দু পেয়ালা খাওয়া হয়ে গেছে।"

বললাম, "জানুয়ারি মাসের এই হাড়-কাঁপানো শীতের দিনে তৃতীয় পেয়ালা চা অগ্রাহ্য করেছেন শুনলে Tea Cess Board-এর বড় সাহেব অভিমান ক'রে বলবেন, 'তবে আর কবে তিন পেয়ালা চা খাবেন!'...তা ছাড়া, জানেন ত পোর নামে পোয়াতী বাঁচে! আপনার এক পেয়ালা হ'লে আমারও কোন্-না এক পেয়ালা হবে।" ব'লে অন্দরে প্রবেশ করলাম।

একা সুধাংশুবাবুকে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম।

দোতলা থেকে নেমে বৈঠকখানার দোরের কাছে উপস্থিত হয়ে শুনতে পেলাম অনিলের কণ্ঠস্বর। পরদা অল্প একটু সরিয়ে দেখলাম, সুধাংশুবাবু আর অনিল ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। তা হ'লে বেশি আর-এক পেয়ালা চায়ের প্রয়োজন।

যে ঘরে চা প্রস্তুত হয় তার দ্বারদেশে উপনীত হয়ে ডান হাতের তিনটে আঙুল দেখিয়ে সঙ্কেত করলাম, 'তিন পেয়ালা চা।' উত্তরে বউমার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী সেই নির্বাক সাঙ্কেতিক ভাষার দ্বারাই ইঙ্গিত করলে ভূমির উপরে স্থিত একটি পাত্রের প্রতি। দেখলাম, পাত্রটির উপর বিরাজ করছে তিন প্রস্ত পেয়ালা; যার মধ্যে দুটি প্রধূমিত চায়ে উষ্ণ, একটি উষ্ণ হবার অপেক্ষায় শূন্য। বুঝলাম অনিলের কণ্ঠস্বর শুধু আমার কানেই পৌঁছোয় নি।

হাসিমুখে মাথা নেড়ে সন্তোষ জানিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম; এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল ভৃত্য তিন পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা বহন ক'রে।

বিস্মিতকণ্ঠে অনিল বললে, "এ কি ব্যাপার দাদা? তিন পেয়ালা চা।"

বললাম, "কেন, খুব সহজ ব্যাপার। আমরা সংখ্যায় তিন জন, চা-ও কাজে-কাজেই তিন পেয়ালা।"

"কিন্তু সংখ্যায় আমরা তিনজন সে কথা ত আপনার জানা ছিল না। আপনি ত সুধাংশুবাবু আর আপনার জন্যে দু পেয়ালা চায়ের

ফরমাস দিতে গিয়েছিলেন। আরও এক পেয়ালার দরকার হবে, কেমন ক'রে জানলেন ?"

বললাম, "জানবার যে একাধিক উপায় নেই, তাই বা তুমি কেমন ক'রে জানলে ? পদার্থ-বিদ্যা তোমাদের এমন পেয়ে বসেছে যে, মনোবিদ্যাকে তোমরা অপদার্থ-বিদ্যা মনে কর। Telepathy হয়ত বিশ্বাস কর না ?"

সহাস্যমুখে অনিল বললে, "Telepathy বিশ্বাস করি, কি করি নে, সে তর্কে যাবার দরকার নেই ; আমার অস্তিত্ব আপনি জানতে পেরেছেন কর্ণপ্যাথির দ্বারা। কান দিয়ে আমার কণ্ঠস্বর শুনেছেন।"

তিন জনের উচ্চহাস্যে কক্ষ চকিত হয়ে উঠল।

এক এক পেয়ালা চা সম্মুখে নিয়ে বসা গেল বৈঠক জমাতে।

সুধাংশুবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "আপনি টেলিপ্যাথি বিশ্বাস করেন সুধাংশুবাবু ?"

সুধাংশুবাবু বললেন, "যখন যোগবিদ্যা অধ্যাত্মবিজ্ঞান সাহস ক'রে অবিশ্বাস করি নে, তখন টেলিপ্যাথি অবিশ্বাস করি কোন সাহসে ? টেলিপ্যাথি ত যোগবিদ্যার তলার দিকের সিঁড়ি।"

আমি বললাম, "ঠিক তাই। টেলিপ্যাথির দ্বারা দূরস্থিত দুটি মনের মধ্যে চিন্তার যোগাযোগ চলে। একজন ইংরেজ কবি বলেছেন, Star to star vibrates light, may not soul to soul ? এই soul to soul-এর যোগাযোগ টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কিছুই নয়। টেলিপ্যাথির দ্বারা চায়ের পেয়ালার সংখ্যা ঠিক করা যেতে পারে, কিন্তু উচ্চমাত্রার যোগবলের দ্বারা গরম চা সমেত পেয়ালা সৃষ্টি করা চলে।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

সুধাংশুবাবু বললেন, "টেলিপ্যাথির সঙ্গে চায়ের পেয়ালার সংখ্যা আপনি যেরকম দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে রেখেছেন তাতে মনে হয়, টেলিপ্যাথি আর যোগবলের ওপর আপনার নিজের আস্থা একই রকম।" ব'লে হাসতে লাগলেন।

উত্তরে বললাম, "আমার মতো সামান্য লোকের আস্থা-অনাস্থায় বিশেষ কিছু আসে-যায় না; স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যোগবল বিশ্বাস করতেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে জটিলতার দুর্মোচ্য গ্রন্থি যোগবলের কাঁচির সাহায্যে অবলীলার সহিত মোচন করেছেন। উপস্থিত আমার একটা যোগবলের কাহিনী মনে পড়ছে, যা বিশ্বাস না করলেও শুনে খুশী হবার উপযুক্ত।"

অনিল বললে, "দাদা, বিশ্বাস করার চেয়ে খুশী হওয়ার মূল্য কম নয়। সুতরাং কাহিনীটা শোনাই যাক।"

পেয়ালার শেষ-চুমুক চাটুকুর সদ্গতি ক'রে বলতে আরম্ভ করলাম, "ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর আগের কথা। তখন আমরা সপরিবারে পূর্ণিয়ায় বাস করি। দাদা আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওকালতি করতে আরম্ভ করেছেন। গল্পটা তাঁরই কাছে শোনা। পূর্ণিয়া-বারে একজন বিহারী সিনিয়ার উকিল ছিলেন, নামটা কিছু-আগেও মনে ছিল, ধরা যাক জানকীপ্রসাদ তেওয়ারী। উদারচরিত্রের ঈশ্বরপরায়ণ সাত্ত্বিকপ্রকৃতির মানুষ। ওকালতিতে প্রসার খুব বেশি, কিন্তু তার জন্যে পূজা-পাঠে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি প্রবল অনুরাগ। সে অনুরাগের কথা সাধুজগতে সুবিদিত। তাই ভারতবর্ষের যে-কোনো অঞ্চল

থেকে সাধু-সন্ন্যাসী পূর্ণিয়ায় এলে তাঁদের জন্যে তেওয়ারিজীর সদাব্রত উন্মুক্ত থাকত।

একদিন সকালে মক্কেলদের কাজকর্ম সেরে তেওয়ারিজী উঠবেন-উঠবেন করছেন, আদালত যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, এমন সময়ে এক দীর্ঘকায় সাধু এসে উপস্থিত। ডান হাত তুলে সাধু বললেন, 'জয় হোক বাবা!'

দুই হাত জোড় ক'রে নত হয়ে জানকীপ্রসাদ বললেন, 'গোড় লাগি মহারাজ।' তারপর সাধুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে করজোড়ে বললেন, 'কি আদেশ বলুন?'

স্মিতমুখে সাধু বললেন, 'বাবা, আজ আমি তোমার বাড়িতে সামান্য একটু আহার করব।'

তেওয়ারিজী বললেন, 'কৃতার্থ হলাম। আমাকে ত' এখন আদালত যেতে হবে, আমার স্ত্রীকে আমি ব'লে যাচ্ছি, তিনি আপনার সেবার ব্যবস্থা করবেন।'

সাধু বললেন, 'তার আগে সামান্য জপ-তপ করব। তার জন্যে একটু নিরালা জায়গা হ'লে ভাল হয়।'

তেওয়ারিজী বললেন, 'সে ব্যবস্থাও নিশ্চয় হবে। আমি হাত-মুখ ধোবার জল পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ততক্ষণ বারান্দার তক্তাপোশের ওপর একটু বিশ্রাম করুন।'

সাধু-সন্ন্যাসীদের নিরন্তর সংস্রবে আসার ফলে সাধুদের ভাব-ভঙ্গি-হাসি দেখে, কথাবার্তা শুনে সাধুদের স্তর-নির্ণয়ের একটা ক্ষমতা জানকীপ্রসাদ আয়ত্ত করেছিলেন। সেদিনকার সাধুটিকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, সে সাধু সাধারণ স্তরের নন। কাছারি যাবার সময়ে সাধুর নিকট উপস্থিত হয়ে জানকীপ্রসাদ বললেন, 'বাবা,

আমি এখন আদালত চললাম।' নিকটে একজন চাকর দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ রইল আপনার পরিচর্যায়। যখন যা প্রয়োজন হবে, একে বলবেন। আপনার জপের জায়গা প্রস্তুত আছে।'

সাধু বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এস। আমার প্রয়োজন শেষ হ'লে তোমার পুণ্যাশ্রমের কল্যাণ কামনা ক'রে আমি প্রস্থান করব।'

ব্যগ্রকণ্ঠে জানকীপ্রসাদ বললেন, 'একটা রাতও আমাদের কাছে অবস্থান করবেন না?'

হাসিমুখে সাধুজী বললেন, 'না, তার সুবিধে হবে না। আমার একটু বিশেষ ত্বরা আছে।'

জানকীপ্রসাদ বললেন, 'আহারের পর একটু বিশ্রাম করবেন ত?'

তেমনি হাসিমুখে সাধু বললেন, 'সাধুরা বিশ্রাম মনের মধ্যে করে।'

গভীর আকুতির সঙ্গে জানকীপ্রসাদ বললেন, 'বাবা, এমন সময়ে দেখা দিলেন যে, এক মুহূর্ত অপেনার কাছে বসবার সুবিধা পেলাম না। আমি কাছারি থেকে ফেরবার আগে আর একবার দর্শন না দিয়ে যাবেন না। দয়া ক'বে কথা দিন।'

এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে সাধু বললেন, 'আচ্ছা।'

কাছারিতে জানকীপ্রসাদ কাজকর্ম করেন, তার মধ্যে থেকে থেকে মনের পরদায় ভেসে ওঠে সন্ন্যাসীর আয়ত আকৃতি আর শুচিশান্ত মুখ। হাতের কাজ যা ছিল তাড়াতাড়ি সেরে, কতক জুনিয়ার উকিলদের জিম্মা লাগিয়ে বেলা তিনটে আন্দাজ তিনি

বাড়ি ফিরে আসেন। স্ত্রীর কাছে জানতে পারেন, সাধু তখনও জপে নিমগ্ন।

বেশ পরিবর্তন ক'রে জানকীপ্রসাদ স্ত্রীর সহিত সাধুসমীপে গমন করেন।

প্রথমে একটি ছোট কুঠরি। তার এক দিকে বিস্তৃত স্থান জুড়ে ভোজনের নানাবিধ উপকরণ—ফল-মূল, মিঠাই-মণ্ডা, ক্ষীর-ছানা, চুড়া-দহি, স্ফটিক পাত্রে মিছরির পানা; সাধুর যদি আপত্তি না থাকে, অনেক সাধুর থাকে না, এক দিকে কালো পাথরের থালায় খান কুড়ক উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ব পুরি, আলুর তরকারি, চাটনি। সংখ্যায় যেমন বহু, পরিমাণেও তেমনি বেশি।

ভোজনের ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়ে জানকীপ্রসাদ সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়লেন।

পরবর্তী নিভৃততর কুঠরিতে সাধু জপ করছেন। জানকীপ্রসাদের স্ত্রী অন্দরমহলে ফিরে গেলেন, জানকীপ্রসাদ অতি সন্তর্পণে সাধুর কক্ষে প্রবেশ করলেন।

ঋজু খাড়া দেহে সাধু তখনও ধ্যান-নিমীলিত নেত্র, দীর্ঘ হাত দুখানি মিলিত হয়ে কোলের ওপর নির্বিকল্প বিরতিভরে প'ড়ে আছে। ধীরে ধীরে জানকীপ্রসাদ এক পাশে উপবেশন করলেন।

ক্ষণকাল পরে চোখ খুলে জানকীপ্রসাদকে দেখে হাসিমুখে সাধু বললেন, 'এই যে, এসেছ ? চল, এবার কিছু আহার করা যাক।'

খাবার ঘরে এসে খাবারের আয়োজনের বহর দেখে বিস্ফারিত চক্ষে সাধু বললেন, 'করেছ কি! এত কিছুই দরকার হবে না।' আসনের ওপর ব'সে দু'ভাগে-ফাটানো একটা পাকা বেল থেকে তিন আঙুল দিয়ে অল্প-একটু শাঁস তুলে নিয়ে মুখে ফেললেন; তারপর

হাত ধুয়ে ঘটি থেকে ছু-চার ঢোঁক জল পান ক'রে আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তৃপ্ত হলাম।'

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে জানকীপ্রসাদ বললেন, 'সে কি! আর কিছু খাবেন না?'

হাসিমুখে সাধু বললেন, 'আর কিছু খাবার প্রয়োজন নেই। শুধু আজকের জন্মেই নয়, ছ মাস আর আহারের প্রয়োজন হবে না। আবার ছ মাস পরে যখন ক্ষুধার্ত হব তখন তোমার মতো কোনো সাধু গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হয়ে আহার ক'রে মঙ্গল কামনা জানিয়ে যাব।'

অনেক সাধুর মুখে জানকীপ্রসাদ অনেক অদ্ভুত কথা শুনেছেন, কিন্তু এমন অলৌকিক কথা ইতিপূর্বে আর কারও মুখে শোনেন নি। সবিস্ময়ে তিনি বললেন, 'ছ মাস অন্তর আপনি আহার করেন, তাও মাত্র এইটুকু?"

সাধু বললেন, 'আমি ত আহার করি; হিমালয়ের উচ্চ নিভৃত অঞ্চলে এমন ছু-চারজন সাধু আছেন যাঁরা সম্পূর্ণভাবে উদর-বিড়ম্বনা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। তাঁরা পানাহার ব্যতিরেকেও জীবিত অবস্থায় সাধন-ভজন ক'রে চলেছেন।'

ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সাধু বললেন. 'আচ্ছা বাবা, আমি চললাম। তোমার মঙ্গল হোক।' ব'লে প্রস্থানোদ্যত হলেন।

জানকীপ্রসাদ আর একবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করলেন; বললেন, 'কথাবার্তা ত কিছুই হ'ল না বাবা, রাত্রি না কাটান, আর কিছুক্ষণ দয়া ক'রে সঙ্গদান করুন।'

সাধু বললেন, 'দেখ, আগামী কাল ব্রাহ্ম মুহূর্তে প্রয়াগে আমাকে স্নান করতে হবে। এখনই বেরিয়ে না পড়লে একটু অসুবিধেয় পড়ব।'

ছ মাস অন্তর আহারের বিস্ময়-কাহিনীর পর এ আবার আর-এক নূতন বিস্ময়। সে যুগে বিমানপোত ত দূরের কথা, মোটরকারও আবিষ্কৃত হয় নি। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে জানকীপ্রসাদ বললেন, 'এখন বেরিয়ে পড়লেই বা কাল ব্রাহ্ম মুহূর্তে কি ক'রে প্রয়াগে উপস্থিত হবেন? পাখী হয়ে উড়ে গেলেও ত তা পারা যাবে না।'

স্মিতমুখে সাধু বললেন, 'তা হ'লে পাখী হয়ে উড়ে যাব না।'

কুঞ্চিত চক্ষে জানকীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবুও পারবেন?'

তেমনি হাসিমুখে সাধু বললেন, 'আশা ত করি।'

আশা করার বিরুদ্ধে ত আর লড়াই করা চলে না; জানকী-প্রসাদ চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে দর্শনলাভের জন্যে সাধুকে চেপে ধরলেন; বললেন, 'এবার ত আপনার সঙ্গে কোনো প্রসঙ্গই হ'ল না; ভবিষ্যতে আবার আমাকে দর্শন দেবেন, সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।'

সাধু বললেন, 'দেখ, সংসারের মধ্যে যত না আসা যায়, আমাদের পক্ষে ততই ভাল। কিন্তু সংসারী হয়েও তুমি একজন সাধু, তোমার যখন এত আগ্রহ তখন প্রতিশ্রুত হলাম—আবার তোমাকে দেখা দোব।'

আনন্দিত হয়ে জানকীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে, কত দিনে বাবা?'

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সাধু বললেন, 'আচ্ছা, আগামী বৎসরে ঠিক আজকের দিনে।'

সাধু-সন্ন্যাসীকে বেশি পেড়াপিড়ি করতে নেই, জানকীপ্রসাদ যুক্ত করে নত হয়ে অভিবাদন করলেন।

আর একবার জানকীপ্রসাদের মঙ্গল কামনা ক'রে সাধু বারান্দা থেকে নেমে কম্পাউণ্ড পেরিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে গেলেন।

সাধু-সন্ন্যাসীদের কথায় সন্দেহ করার অথবা সে কথার সত্যা-সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করার অভ্যাস জানকীপ্রসাদের নেই, তথাপি কি তাঁর মনে হল, সম্মুখে উপস্থিত জন দুই চাকরকে বললেন, 'যা ত, দেখে আয় সাধুবাবা কোন্ দিকে কোন্ পথে গেলেন!'

চাকরেরা ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর দশ-পনের মিনিট বাদে ফিরে এসে জানালে, ডাইনে বাঁয়ে পথের পোয়াটাক ক'রে দেখেও, আর আশপাশ চতুর্দিকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও তারা সাধুবাবার কোনো পাত্তা লাগাতে পারে নি।

শুনে জানকীপ্রসাদ একটু চিন্তাগ্রস্ত হলেন। রাত্রে ডায়রির সেদিনকার পাতায় সাধুর বৃত্তান্ত একটু বিশদভাবে লিখে রাখলেন। তারপর দিনপাতের সঙ্গে কাজকর্মের ভিড়ে সাধুর কথা একরকম ভুলেই গেলেন।

ছুটির দিন। মক্কেলে পরিবৃত হয়ে জানকীপ্রসাদ মকদ্দমার কাগজপত্র দেখছেন, আরা থেকে টেলিগ্রাম এল—মা কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

রইল প'ড়ে মকদ্দমা আর মক্কেল, মাতৃভক্ত জানকীপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আরার পথে বেরিয়ে পড়লেন। আরার অতি নিকটে এক গ্রামে জানকীপ্রসাদের পৈতৃক নিবাস।

শুধু জানকীপ্রসাদকে শেষ দেখা দেবার জন্যেই মা অপেক্ষা করছিলেন।

মার শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ ক'রে জানকীপ্রসাদ পূর্ণিয়া ফিরছেন। আরা স্টেশনে রেলে চ'ড়ে জানলার ধারে ব'সে প্ল্যাটফর্মের অতি-

ব্যস্ততার দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে আছেন। গার্ড হুইস্‌ল্‌ দিলে, এঞ্জিন ষ্টীম্‌ ছাড়লে, ড্রাইভার বাঁশী বাজালে, ট্রেন দুলে উঠল,—এমন সময়ে কানে এসে পৌঁছাল এক ডাক—'বাবা।'

চকিত হয়ে জানকীপ্রসাদ চেয়ে দেখেন, তাঁর জানলার অতি নিকটে দাঁড়িয়ে সেই দীর্ঘকায় পূর্ণিয়ায়-দেখা সাধু। শান্তস্মিতমুখে সাধু বললেন, 'বাবা, তোমার কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম আবার দেখা দোব, আজ সেই প্রতিশ্রুতি রাখলাম।'

আর্ত-ব্যগ্র কণ্ঠে জানকীপ্রসাদ বললেন, 'একে কি প্রতিশ্রুতি রাখা বলে ? এ ত প্রতিশ্রুতি ভাঙা।' কি করবেন ভেবে না পেয়ে জানকীপ্রসাদ গাড়ির দরজার হাতলে হাত দিলেন।

বাধা দিয়ে সাধু বললেন, 'ব্যস্ত হ'য়ো না,—তোমার মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক।' ব'লে দক্ষিণ হস্ত উঁচু করলেন, মুখে সুমিষ্ট হাসি।

তখন ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছে। নিরুপায় হয়ে জানকীপ্রসাদ সাধুর দিকে চেয়ে ব'সে রইলেন। যতক্ষণ দেখা গেল সাধুও ঊর্ধ্বহস্ত হয়ে জানকীপ্রসাদের দিকে চেয়ে প্ল্যাটফর্মে একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক লাইন থেকে অন্য লাইনে ট্রেন গতি পরিবর্তিত করলে প্ল্যাটফর্ম অদৃশ্য হ'ল।

পূর্ণিয়ায় পৌঁছে পূর্ব-বৎসরের ডায়রি বার ক'রে জানকীপ্রসাদ মিলিয়ে দেখলেন, এক বৎসর পরে ঠিক যথানির্দিষ্ট দিনেই সাধু আরার প্ল্যাটফর্মে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।"

গল্প শেষ ক'রে সুধাংশুবাবুকে বললাম, "সাধুর এই কাহিনী সম্বন্ধে আপনি যা বলতে চান, বলুন।"

সুধাংশু বললেন, "যে মন্তব্য ক'রে আপনি কাহিনী আরম্ভ

করেছিলেন, এ কাহিনী সম্বন্ধে বোধ হয় সেইটেই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্তব্য,—বিশ্বাস না হ'লেও কাহিনীটি শুনে খুশী হবার উপযুক্ত।” ব'লে হেসে উঠলেন।

অনিল বললে, “আর, আমি যে মন্তব্য করেছিলাম,—বিশ্বাস করার চেয়ে খুশী হওয়ার মূল্য কম নয়,—এ কাহিনী সে কথাও প্রমাণ করেছে। সত্যিই কাহিনীটি খুশী হবার উপযুক্ত।”

আমি বললাম, “কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এ কাহিনী বিশ্বাস করবার উপযুক্ত কি-না!”

সুধাংশুবাবু বললেন, “এ তর্ক তুলে সম্ভবত অনেক বাজে কথার ধূলো উড়বে, অথচ কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। আর-একদিন না হয় এ বিষয়ে যথাসাধ্য ও যথাধারণা আলোচনা করা যাবে।” ব'লে উঠে দাঁড়ালেন।

অনিল বললে, “এরই মধ্যে চললেন?”

সুধাংশুবাবু বললেন, “এরই মধ্যে ঠিক নয়। এসেছিও অনেকক্ষণ, বেলাও কম হয় নি। তা ছাড়া, একবার সুবোধবাবুর ওখানে হয়ে যেতে হবে।”

সুবোধবাবু, অর্থাৎ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ও সুবিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-সমালোচক। সুবোধবাবুর ওখানে হয়ে যাওয়া আজ সুধাংশুবাবুর প্রথম দিনের ব্যাপার নয়—নিত্য-নিয়মিত বলা যেতে পারে। আমার বৈঠকে এলে সুবোধবাবুর বাড়ি না হয়ে সহজে তিনি বাড়ি ফেরেন না।

“আচ্ছা আসি।” ব'লে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে

সুধাংশুবাবু বললেন, "কিন্তু আপনার ইউনিভার্সিটির ব্যাপারটা ত শোনা হ'ল না ?"

আমি বললাম, "সে এমন কিছু নয়, আর কোনদিন শুনলেই হবে।"

"আচ্ছা।" ব'লে সুধাংশুবাবু প্রস্থান করলেন।

অনিল বললে, "দাদা, সাধুর গল্প আপনি বিশ্বাস করেন ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বললাম, "দেখ, সত্যি কথা বলতে গেলে, মনে-মনে বিশ্বাস করি নে, কিন্তু যুক্তি-তর্ক খাটাতে গেলে অবিশ্বাসও করি নে।"

বোধ হয় আমার কথাটা এক মুহূর্ত ভেবে দেখে অনিল বললে, "এ ত একটু উল্টো কথা হ'ল দাদা। অনেক কথা আমরা মনে মনে বিশ্বাস করি, কিন্তু যুক্তি-তর্কের মধ্যে অবিশ্বাস করি। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর'—এই ত আমাদের মনের সাধারণ গতি।"

আমি বললাম, "এই বিশেষ বিষয়টিতে আমার মনের গতি হয়ত একটু ভিন্ন পথের। আমি ত বলছি নে, যুক্তি-তর্কের দ্বারা আমি বিশ্বাস করি; আমি বলছি, যুক্তি-তর্কের দ্বারা অবিশ্বাস করি নে। আমার মনের এই গতির সপক্ষে প্রধান যুক্তি হচ্ছে— There are more things in heaven and earth, Upendra, than are dreamt of in your own logic যা আমাদের সুদূর কল্পনার অতীত ছিল, এমন অনেক ব্যাপার কালক্রমে আমাদের বস্তুজগতে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত টেলিভিশন। বস্তুজগতে টেলিভিশন যখন সম্ভব হয়েছে, মনোজগতে টেলিপ্যাথি সম্ভব নয়, তা জোর ক'রে বলা চলে না। আজকালকার হাইড্রোজেন অণুর যুগে বিকটশক্তি রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর নরনারীকে যখন

চন্দ্রলোকে মঙ্গলগ্রহে চালান দিয়ে উপনিবেশ গঠনের তোড়জোড় চলছে, যা একদিন বাস্তবে পরিণত হবে ব'লে আমাদের অবিশ্বাস হচ্ছে না, তখন একদিন যোগবিদ্যার সহায়তায় স্থূল দেহকে সূক্ষ্ম দেহে পরিণত ক'রে অতিক্রতগতিতে পূর্ণিয়া থেকে প্রয়াগে চালান দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই বা কেমন ক'বে জোবের সঙ্গে বলা চলে?"

অনিল বললে, "কিন্তু আপনার এই যুক্তিধারার বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হচ্ছে, সে যোগবিদ্যা লুপ্ত হ'ল কেন?"

আমি বললাম, "তোমাব এই আপত্তির বিরুদ্ধে আমার দুটি কৈফিয়ত দেবার আছে। প্রথমত, লুপ্ত হয়েছে—সে কথা জোর ক'বে বলা চলে না; দ্বিতীয়ত, যদি লুপ্ত হয়েই থাকে, আমাদেব ভারত-বর্ষীয় গুরুদের নিজ-নিজ বিদ্যা আত্মগত ক'রে লুকিয়ে রাখার কুপ্রথার ফলে এমন অনেক বিদ্যাই লুপ্ত হয়েছে। পৃথিবীর গর্ভ থেকে মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের মতো, বিলুপ্তির গর্ভ থেকে যোগবিদ্যাও কোন-একদিন আবিষ্কৃত হতে পাবে।"

আমার কথার উত্তবে অনিল কিছু বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু অপরিচিত আগন্তুকের প্রবেশের জন্য তাতে বাধা পড়ল।

নমস্কারপূর্বক আগন্তুক বললেন, "আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে উপেনবাবু।"

বললাম, "বসুন।"

চেয়ারে উপবেশন ক'বে আগন্তুক অনিলের প্রতি এমন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন যে, অনিলকে বলতেই হ'ল, "খানিকটা ধূলো ওড়ানো ত গেল, বাকিটুকু সুধাংশুবাবুর সঙ্গে কোনদিন ওড়ানো যাবে। আজ চলি দাদা।"

বললাম, "এস।"

১৭

প্রত্যূষের চা-পান শেষ ক'রে 'মাটির পথে'র দপ্তর খুলে বসেছি। 'মাটির পথ' আমার ক্রমলিখিত উপন্যাস,—মাসে মাসে ধারাবাহিক ভাবে 'গল্প-ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

উপন্যাসের নায়িকা সীমা সম্প্রতি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বাংলা সাহিত্যে এম-এ পাস করেছে। এতটা না হ'লেও, পরীক্ষায় এমনি একটা সাফল্যের কামনা ক'রে পিসিমা যোগমায়া সত্যনারায়ণ পূজার মানত করেছিলেন। সেই পূজায় উপস্থিত থাকবার অনতিক্রমণীয় আমন্ত্রণে দিন দুয়েকের জন্য সীমা চলেছে কোলাঘাট হতে মাইল আষ্টেক দূরবর্তী নন্দীহাটা গ্রামে। দৈবক্রমে দিলীপকে হতে হয়েছে তার সহযাত্রী।

দিলীপ সীমার বউদিদি মালতীর খুড়তুত ভাই,—রূপবান, চরিত্রবান, ধনবান, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ বেতনে সরকারী অফিসে প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী ; সুতরাং স্বীকার করতেই হয় প্রণয় এবং পরিণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর পাত্র। তথাপি দিলীপ এবং সীমার মধ্যে প্রণয়ের যে প্রবল স্রোত বহমান, তা নিতান্তই একদিগ্‌গামী। সে স্রোতের সকল তরঙ্গ সীমার অনুগ্রহলাভের তটপ্রান্তে এসে আছাড় খায় ; অননুরাগ-কঠিন সে তট তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের দ্বারা সিক্ত হয়, কিন্তু বিগলিত হয় না। যাত্রার পূর্বে মার্জিতরুচি দিলীপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সীমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, নন্দীহাটা যাতায়াতের পথে অথবা নন্দীহাটায় অবস্থানকালে নূতন কোনো তরঙ্গাঘাতে তাকে বিব্রত করবে না। সীমা অবশ্য সে প্রতিশ্রুতি দাবি করে

নি, অথবা তেমন কোনো প্রতিশ্রুতির প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে নি।

হাওড়া স্টেশন হতে কোলাঘাটগামী প্রত্যূষ পাঁচটার ট্রেনে একটা নির্জন ফার্স্ট ক্লাস কুপে-কম্পার্টমেণ্টে সীমা ও দিলীপকে তুলে দিয়ে এক পক্ষে দিলীপের প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিষ্ঠা, শীলতাবোধের দৃঢ়তা, অথচ বিচিত্র অবস্থাজাত অবারণীয় চিত্তবেগের দুরন্ততা,—এবং অপর পক্ষে সীমার অতল-গভীর অন্তরের দুরন্মেয় রহস্যময়তার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা একটা রসঘন অনন্যসুলভ পরিবেশ রচনার মতলবে আছি,—এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন কবি শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।

চড়ুকে হাসি হেসে বললাম, "আসুন।"

দপ্তর গোটাতে গোটাতে শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত চেয়ার দেখিয়ে বললাম, "বসুন।"

চেয়ারে উপবেশন ক'রে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "লিখছিলেন ?"

অস্বীকার করতে পারলাম না ; বললাম, "একটু।"

কুণ্ঠিত স্বরে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "তা হ'লে ত ক্ষতি করলাম !"

বললাম, "ক্ষতি করলেন, কি কি-করলেন, সে জটিল অঙ্ক কষবার চেষ্টায় না গিয়ে আপাতত খুশী হওয়া যাক।"

হেসে উঠে অরীন্দ্রজিৎ বললেন, "সেই কথাই ভাল।"

অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে সরকারী চাকরি করতেন, অবসর গ্রহণ ক'রে কলিকাতায় এসে বাস করছেন। 'আকাশ-গঙ্গা', 'নতুন কবিতা' ও 'চার্বাকের উক্তি' নামে তিনখানি কবিতার বই এঁর রচিত। 'নতুন কবিতা' ও 'চার্বাকের উক্তি' দুখানি বই-ই আমার সেল্‌ফে আছে। বই দুখানি আমার ভাল লেগেছে

দু-চারটে সাধারণ আলাপ-আলোচনার পর অরীন্দ্রবাবু বললেন, "দেখুন উপেনবাবু, কোনো আঘাত যখন অপরাধের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারায়, তখন সে আঘাত বেদনার চেয়ে কৌতুকই উদ্রিক্ত করে বেশি।"

বললাম, "সে-রকম সামঞ্জস্যহীন আঘাত সম্প্রতি পেয়েছেন না-কি?"

"মনে ত হচ্ছে পেয়েছি।"

"কৌতুক বোধ করছেন?"

"আচ্ছা, আপনিই বিচার ক'রে দেখুন, কৌতুক বোধ করা উচিত কি-না।" ব'লে পকেট থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটা ভাঁজ-করা পাতা বার ক'রে খুলে আমার সম্মুখে মেলে ধ'রে আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

সেখানে অরীন্দ্রবাবুর কাব্যপুস্তক 'চার্বাকের উক্তি' সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে,—"অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, অমুক ও অমুকের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ভাষা ও ছন্দের উচ্ছ্বাসময় অনিপুণ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু অনুপস্থিত। এঁদের কারো রচনাই এখনও প্রকাশযোগ্যতার স্তরে আসে নি। লোকলোচনের অন্তরালে দীর্ঘকাল অনুশীলন ছাড়া এঁদের সকলের পক্ষেই কবিযশ-প্রাপ্তি দুরূহ।"

পড়া শেষ ক'রে কাগজখানি অরীন্দ্রবাবুকে ফেরত দিলাম।

অরীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কবিতা সম্বন্ধে আপনারও কি এই মত?"

বললাম, "নয়, তা ত আপনি নিশ্চয় ক'রেই জানেন। প্রথমত, আপনার 'চার্বাকের উক্তি' প'ড়ে খুশী হয়েছি, সে কথা

আপনাকে পূর্বে জানিয়েছি। দ্বিতীয়ত, আপনার কবিতাপুস্তক 'নতুন কবিতা'র ভূমিকায় আমি আপনার কাব্যশক্তির প্রশংসা করেছি।...আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। 'চার্বাকের উক্তি' বইখানি থেকে যা-হয় একটা কোনো কবিতা নিয়ে একটু পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক, সে কবিতাটি সমালোচক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমর্থিত করে অথবা করে না।"

সেল্‌ফ্ থেকে 'চার্বাকের উক্তি' বইখানা টেনে নিয়ে একটু উল্টে-পাল্টে দেখে বললাম, "আচ্ছা একেবারে প্রথম কবিতাটাই পড়া যাক। ছোট আছে, সবটা পড়া যাবে।"

পড়তে লাগলাম,—

"জন্মদিন

আমাব যে জন্মদিন
প্রতি বর্ষে একদিন
আসে যায় অলক্ষিত স্বাগত-বিহীন।
প্রতি বর্ষে ভেবে রাখি ঠিক ঐ দিনে
স্বীকার করিয়া লব তারে
স্মরণের আলোকে অন্ততঃ
কিছুক্ষণ।
কিন্তু হায়, প্রতিবারে হয় বিস্মরণ
সেই কথা;
তার পর যবে মনে হয়
তখন সে তারিখটি হাতে আর নাই;
উড়ে-যাওয়া পাখীটিরে
মনে মনে একবার পিছু ফিরে চাই।"

গভীর মনোযোগের সহিত অরীন্দ্রবাবু কবিতা পড়া শুনছিলেন, পড়া শেষ হ'লে বললেন, "পরীক্ষায় কি দাঁড়াল উপেনবাবু?"

বললাম, "একটু সবুর করুন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সমালোচনার ওপর আর একবার ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, "সমালোচক বলেছেন, 'অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, অমুক ও অমুকের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ভাষা ও ছন্দের উচ্ছ্বাসময় অনিপুণ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু অনুপস্থিত।' অপর দুই কবির কাব্য সম্বন্ধে আমার কোনো কথা বলা চলে না, কারণ, তাঁদের বই পড়বার সুযোগ হয় নি। তাই অমুক ও অমুক ব'লে উহ্য রাখাই সঙ্গত মনে করেছি। কিন্তু আপনার 'জন্মদিন' কবিতা সম্বন্ধে বলতে পারি, কোনো জিনিস যদি তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে ত ভাষা ও ছন্দের উচ্ছ্বাসময় অনিপুণ ব্যবহারই আছে। এত অল্প শব্দের এত সংযত সহজ প্রকাশের মধ্যে ত ও-পদার্থ খুঁজে পাচ্ছি নে। আর, ভাবসম্পদ সম্বন্ধে বলতে পারি, হালকা রসের এত ক্ষুদ্রকায় কবিতার মধ্যে কতটাই বা সে বস্তু প্রত্যাশা করা যেতে পাবে? শরবতের মধ্যে সুরার ঝাঁজ না পেলে শরবতওয়ালাকে দোষ দেওয়া অনুচিত।"

অরীন্দ্রবাবু বললেন, "আবার শরবতের মধ্যে সুরার ঝাঁজ না পেয়ে শরবতওয়ালার ওপর অনেকে ক্রুদ্ধ হনও নি। এ বছরের পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে, মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' ও অগ্রহায়ণ মাসের 'মন্দিরা'য় 'চার্বকের উক্তি'র যে সব সমালোচনা বেরিয়েছে সেগুলিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই বলা যেতে পারে। তা হ'লে কি বলবেন বলুন?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বললাম, "তা হ'লে হয়ত বলব, ভিন্ন-রুচির্হি লোকঃ।"

"কিন্তু তাই ব'লে এতটা ভিন্ন? একেবারে poles asunder!"

বললাম, "রুচির ক্ষেত্রেই poles asunder হয়। ভূমির ক্ষেত্রের কোন ব্যবধানকে সহজে poles asunder বলা চলে না। Poles asnnder-এর সেই চিরন্তন অমূল্য গল্পটি আপনি নিশ্চয় জানেন। কোনো বিখ্যাত শিল্পীর অঙ্কিত একটি নারীচিত্রের প্রতিলিপি কোনো সাধারণ চিত্রশালার এক স্থানে টাঙিয়ে তলায় লিখে দেওয়া হয়েছিল—এই চিত্রের যে স্থান যাঁর সবচেয়ে ভাল লাগবে তিনি যেন পাশে-ঝোলানো পেন্সিল দিয়ে সেই স্থান চিহ্নিত ক'রে দেন। দেখতে দেখতে সেই নারীচিত্রের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সকল স্থান পেন্সিল-চিহ্নে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল। কিছুকাল পরে সেই নারীচিত্রেরই আর একটি প্রতিলিপি টাঙিয়ে দিয়ে তলায় লিখে দেওয়া হয়েছিল, এই চিত্রের যে স্থান যাঁর সবচেয়ে খারাপ লাগবে তিনি যেন পাশে-ঝোলানো পেন্সিল দিয়ে সে সব স্থান চিহ্নিত ক'রে দেন। দেখতে দেখতে এবারও সেই নারীচিত্রের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারা মানুষের রুচির poles asunder-ত্বই প্রমাণিত হয়েছিল। সেই নারী-অঙ্গের প্রতিটি স্থানই কারও লেগেছিল খুব ভাল, কারও খুব খারাপ। এখন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সমালোচক যদি বলেন, 'চার্বাকের উক্তি' আমার খুব খারাপ লেগেছে, তাই নিন্দার কলঙ্ক দিয়ে তাকে চিহ্নিত করেছি; তা হ'লে কি করা যায় বলুন?"

ভ্রু-কুঞ্চিত ক'রে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "তা হ'লে, যে যাই বলুক না কেন, তার বিরুদ্ধে কোনো উপায় নেই ?"

বললাম, "আছে। বোধ হয় এইরকম সঙ্কটে পড়েই Dr. Johnson বলেছিলেন —Every man has a right to utter what he thinks truth, and every other man has a right to knock him down for it. আপনার কাব্য সম্বন্ধে সমালোচক যেটা সত্য ব'লে অনুভব করেছেন, সেটা প্রকাশ করবার যেমন আছে তাঁর অধিকার, তেমনি আপনারও অধিকার আছে সে সমালোচনার জন্যে তাঁকে knock down করবার। অবশ্য রুচির ক্ষেত্রে ঘুসি দিয়ে knock down করার রীতি নেই ; করতে হ'লে যুক্তি দিয়ে করতে হয়।"

মৃদু হেসে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "আপনার যদি অসুবিধা না হয় তা হ'লে যুক্তি দেবার একটু চেষ্টা করি।"

বললাম, "যুক্তি দেবার চেষ্টায় বাধা দেবার চেষ্টা করলে আপনি আমাকে যুক্তিদ্বেষী বলবেন। সুতরাং করুন একটু চেষ্টা।"

অরীন্দ্রবাবু বললেন, "আমার মনে হয় সমালোচনা করবার সময় সমালোচক 'চার্বাকের উক্তি' বইখানা উল্টেপাল্টে দেখেন নি। তা যদি দেখতেন, তা হ'লে শেষ পাতায় আমার পূর্বের দুখানি বই 'আকাশ-গঙ্গা' ও 'নতুন কবিতা' সম্বন্ধে ছাপা অভিমতখানি তাঁর দৃষ্টিতে পড়ত, আর তা হ'লে অমন প্রতিকূল সমালোচনা করবার পূর্বে আমার কবিতা সম্বন্ধে কোথায় কারা কি বলেছেন একটু দেখে নিতে পারতেন।"

'চার্বাকের উক্তি'র শেষ পাতা থেকে অরীন্দ্রবাবু প'ড়ে শোনাতে লাগলেন, "আমার প্রথম কবিতাপুস্তক 'আকাশ-গঙ্গা' সম্বন্ধে

'আনন্দবাজার পত্রিকা'ই বলেছেন—'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কাব্য-রসিক মাত্রেই এই বইখানা পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিবেন। 'শাজাহান ও জাহানারা', 'নিদ্রিত নারায়ণ', 'ব্যথার গান' ও আরও কয়েকটি কবিতা আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।'

আমার দ্বিতীয় কবিতাপুস্তক 'নতুন কবিতা' সম্বন্ধে 'দেশ' বলেছেন—'কবিতাগুলিতে তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট ...রসিক সমাজে পুস্তকখানির আদর হইবে।'

আমার তৃতীয় কবিতাপুস্তক 'চার্বাকের উক্তি' সম্বন্ধে 'প্রবাসী' বলেছেন—'গ্রন্থকার বহুদিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁর পরিণত জীবনের কাব্যসাধনার এই ফল রসলিপ্সুর সাধ মেটাবে।'

'মাসিক বসুমতী'র ১৩৬০ সালের ১০০ সেরা বইয়ের তালিকায় আমার 'নতুন কবিতা' বইখানি স্থান পেয়েছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'ভারতবর্ষ', 'উত্তরা', 'দৈনিক বসুমতী' প্রভৃতি কাগজের আর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসা আছে।... পড়ব কি?"

বললাম, "পণ্ডিতের বাক্য হচ্ছে, সর্বমত্যন্তগর্হিতম্। যথেষ্টর চেয়ে যা বেশি, তাই অত্যন্ত; তা হ'লে গর্হিত কাজ করবার কি প্রয়োজন?"

অরীন্দ্রজিৎবাবু হাসিমুখে বললেন, "তা হ'লে গর্হিত কাজ আর করব না। খানিকটা যুক্তি ত পেশ করলাম, এবার আপনি বিচার করুন।"

আমি বললাম, "যখন আপনার 'নতুন কবিতা' বইয়ের ভূমিকায় আপনার কবিতার প্রশংসা করেছি, বিচারকের আসনে বসবার অধিকার তখনই হারিয়েছি। আইনত আমি পড়ি আপনার সাক্ষীর

পর্যায়ে। তবে আপনার পক্ষের ব্রীফ্ নিয়ে সওয়াল-জবাব করবার অধিকার আমার আছে।"

হাসিমুখে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "তা হ'লে, তাই করুন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'চার্বাকের উক্তি' গ্রন্থের সমালোচনা অংশটা চোখের সামনে রেখে আমি বললাম, "সমালোচক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রধানত দুটি অভিযোগ উপস্থাপিত করব,—প্রথমত অসতর্কতার, দ্বিতীয়ত অবিচারের। অসতর্কতার অভিযোগে আমি বলব, কবিযশপ্রাপ্তির জন্য আপনাকে লোকলোচনের অন্তরালে দীর্ঘকাল অনুশীলনের উপদেশ দিয়ে সমালোচক আপনার কাব্যশক্তিকে চরমতম অক্ষমতার ঠিক পূর্ববর্তী অক্ষমতার ভূমিতে বসিয়েছেন। চরমতম অক্ষমতার ভূমিতে বসাতেন, যদি তিনি বলতেন, লোকলোচনের অন্তরালে দীর্ঘকাল অনুশীলন করলেও তাঁর পক্ষে কবিযশপ্রাপ্তি অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, নিন্দা করতে উদ্যত হয়ে তিনি যদি আর একটু সতর্ক হতেন, যদি আলোচ্য পুস্তকেরই শেষ পত্রে মুদ্রিত অভিমতগুলির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে এটুকু লক্ষ্য করতেন যে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এবং 'দেশে'ই আপনার কবিপ্রতিভা স্বীকৃত হয়েছে, তা হ'লে বোধ হয় আপনার প্রতি অতটা নির্মম হতে ইতস্তত করতেন। লোক-লোচনের অন্তরালে আপনাকে দীর্ঘকাল কাব্যপাঠের অনুশীলন করতে ব'লে সমালোচক মহাশয় শুধু আলোচ্য বইখানিরই নিন্দা করেন নি, আপনার পূর্বখ্যাতিও মুছে দিয়েছেন। অত্যুক্তি সুখ্যাতির ক্ষেত্রেও অনুচিত, কিন্তু নিন্দার ক্ষেত্রে গর্হিত। সুখ্যাতির মুখ তবুও আলগা করলে চলে, নিন্দার মুখ সামলে রাখতে হয়। কেমন ? ঠিক কি না ?"

অরীন্দ্রবাবু বললেন, "ঠিক ভাবতেই ত ভাল লাগছে। অবিচারের বিষয় আপনি কি বলতে চান ?"

"বলতে চাই, আপনার সঙ্গে আরও দুজন কবিকে এক ব্রাকেটে আবদ্ধ ক'রে এক নিন্দা-শরে বিদ্ধ করার মধ্যে সুবিচারের দাক্ষিণ্য নেই। একান্তই যদি আপনারা তিনজনে অপটু কাব্যচর্চার দ্বারা কোনো অপরাধ ক'রে থাকেন ত সে অপরাধ অফৌজদারীয় inculpable অপরাধ। যারা ফৌজদারী দণ্ডবিধি লঙ্ঘনের দ্বারা একসঙ্গে culpable offence করে, তাদের একসঙ্গে বিচার হ'লেও বিচারকর্তা প্রত্যেক আসামীর নিজ নিজ অপরাধ-কাহিনী ও অপরাধ-মাত্রার বিবেচনা অনুযায়ী স্বতন্ত্র দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। আপনারা তিনজন কবি আপনাদের বিভিন্ন কাব্যগুলিতে এমন আশ্চর্য রকম একভাবে ভাষা ও ছন্দের উচ্ছ্বাসময় অনিপুণ ব্যবহার উপস্থিত করলেন, আর এমন অদ্ভুত অভিন্নতার সঙ্গে অপর সকল বস্তুর অনুপস্থিতি ঘটালেন, যাতে সমালোচক আপনাদের তিন-জনকে একই লোকলোচনের অন্তরালে দীর্ঘকালের জন্যে নির্বাসিত করতে পারলেন—এই বিচারপদ্ধতির মধ্যে যুক্তির মেরুদণ্ড নেই।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাতাখানা ভাঁজ ক'রে অরীন্দ্রজিৎ-বাবুর সম্মুখে স্থাপিত করলাম।

অরীন্দ্রবাবু বললেন, "আচ্ছা উপেনবাবু, আপনাকে যদি বিচার করতে হ'ত, তা হ'লে আপনি কি করতেন ?"

বললাম, "বিচার করতাম।"

হেসে উঠে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "কি বিচার করতেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

বললাম, "বিচার করতে হ'লে 'চার্বাকের উক্তি' থেকে মাত্র

একটা কবিতা প'ড়েই নিরস্ত হতাম না। জায়গা জায়গা থেকে অন্তত আরও গোটা সাত-আট কবিতা প'ড়ে রসবিচারের মাপ-কাঠির দ্বারা প্রমাণ করতাম যে, আপনার কবিপ্রতিভার স্বপক্ষে 'দেশ' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পূর্বে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা অপসিদ্ধান্ত হয় নি, সুতরাং বর্তমান সমালোচক মহাশয় আপনার কবিপ্রতিভার চরম অপটুত্ব সম্বন্ধে যে ফতোয়া দিয়েছেন, তা নাকচ হবার উপযুক্ত।"

সহাস্যে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "এখন দেখছি 'নতুন কবিতা'র ভূমিকা লিখিয়ে আপনাকে সাক্ষীর পর্যায়ে না-ফেলে বিচারকের জন্য মোতায়েন রাখলেই ভাল হ'ত।"

বাইরে পদধ্বনি শোনা গেল, এবং পর-মুহূর্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন অপূর্বরতন ভাদুড়ী।

অরীন্দ্রবাবুকে দেখে উৎফুল্ল মুখে অপূর্বরতন বললেন, "এই যে! কতক্ষণ এসেছেন?"

হাসিমুখে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "তা বেশ কিছুক্ষণ।"

এঁদের দুজনের আলাপ দিল্লীতে। অরীন্দ্রজিৎবাবু যখন দিল্লীতে কাজ করেন, অপূর্বরতন তখন তথায় ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল; কিছুদিন পূর্বে অবসর গ্রহণ ক'রে কলিকাতায় বালিগঞ্জ প্লেসে স্বগৃহে বাস করছেন।

প্রাপ্তি এবং ভোগ—দুইই অদৃষ্টে না থাকলে ঘটে না। সরকার অপূর্বরতনকে অবসর দিয়েছেন, অপূর্বরতন কিন্তু নিজেকে নিরবসর করেছেন সাহিত্য-রচনার কারবারে। সে ছিল দশটা-পাঁচটার ব্যাপার; এ হয়েছে কি-বা দশটার আগে, আর কি-বা পাঁচটার পরে। সরকারী কাজে ট্রেনে মোটরে স্টীমারে টুর ক'রে বেড়াতেন,

আর সেই সুযোগে ভারতময় মন্দির দর্শন করতেন। তখন কি জানতেন, ভারতময় মন্দির একদিন 'মন্দিরময় ভারত' হয়ে তাঁর কাঁধে চেপে বসবে? সম্প্রতি ইনি 'মন্দিরময় ভারত' নামে একটি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

কয়েক মাস আগের কথা। একদিন সকালে বৈঠকখানায় ব'সে অনিল ভট্টাচার্যের সহিত গল্প করছি, অপূর্ব এসে ঘরে ঢুকলেন। দু-চারটে মামুলি কথার পর কুণ্ঠিতস্বরে বললেন, "একটু সময় হবে দাদা?"

এমন দুর্দান্ত কাজের লোক নই যে বলি, হবে না। বললাম, তা হ'তে পারে।

উত্তর শুনে উৎফুল্ল মুখে অপূর্ব পকেটের মধ্যে হাত ঢোকালেন। কি সর্ব্বনাশ! লেখা নয় তো?

ঠিক তাই। পুরো ফুলস্ক্যাপ সাইজের বেশ কয়েক পাতার কপি। আধ ঘণ্টা, তাতে আর সন্দেহ নেই।

অপূর্ব বললেন, "ধরতে গেলে, এইটে আমার প্রথম লেখা। কিছু হয়েছে কি-না আপনার মুখ থেকে জানতে এসেছি।··· পড়ব?"

বললাম, "পড়। প'ড়ো না বলবার পথ রাখি নি।"

পরিণত বয়সের লেখকের অপরিণত প্রথম রচনা শুনে কি বলব ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। তারপর "পরিশেষে" লেখাটি 'গল্প-ভারতী'তে প্রকাশিত করবার অনুরোধ যদি উপস্থিত হয়, তা হ'লে ত সঙ্কটের কথাই হবে। তবে সম্পাদকগিরি করতে করতে এ ধরনের সঙ্কট-মোচনের কৌশলও আয়ত্ত হয়েছে। বললেই হবে, 'তোমার লেখার মধ্যে শক্তির পরিচয় আছে, উপযুক্ত সাধনা করলে সিদ্ধি

অনিবার্য।' এ কথার পর বুদ্ধিমান লেখককে বলতে হয় না, যে লেখাটি তিনি পড়লেন তার মধ্যে সিদ্ধিলাভের প্রমাণ নেই।

পড়া শেষ ক'রে অপূর্ব আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সেই উদ্বিগ্ন উৎসুক দৃষ্টিপাতের মধ্যে ব্যঞ্জনার অস্পষ্টতা ছিল না।

বললাম, "লেখাটা তুমি আমার কাছে রেখে যাও।"

অপূর্ব বললেন, "রেখে যাব ? আচ্ছা।" লেখাটা আমার হাতে দিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, ভাষায় যার একমাত্র অর্থ—ততঃ কিম্ ব'লে ফেলুন, শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি।

বললাম, "এটি আমি 'গল্প-ভারতী'তে প্রকাশ করব।"

ভাষায় এ কথার উত্তর ছিল না,—অপূর্বরতন ভঙ্গির আশ্রয় নিলেন।

'বিচিত্রা' ও 'গল্প-ভারতী' মাসিক পত্রিকা দুটির সম্পাদনার ইতিহাসে লেখকের প্রথম রচনা প্রকাশের জন্য গ্রহণের অভিজ্ঞতা আমার নেই তা নয় ; কিন্তু বিরল। সুতরাং অপূর্ব যদি তাঁর প্রথম রচনাটি প্রকাশের জন্য গৃহীত হওয়ায় আশাতিরিক্ত খুশী হয়ে থাকেন, সে খুশিকে দোষ দেওয়া যায় না।

লেখাটি 'কন্যাকুমারী'—ভারতের দক্ষিণতম তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে মনোরম রচনা। এটি 'গল্প-ভারতী'তে প্রকাশের সিদ্ধান্তে অনিলও খুশী হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে অপূর্ব বলেন, সেদিনের ঘটনায় তাঁর সাহিত্য-রচনার প্রবৃত্তিতে একটা জোরালো স্প্রিংয়ের দম পড়েছিল। হবে। তারপর থেকে ত তাঁর কলম কল হয়ে উঠে রাশি রাশি সৃষ্টি ক'রে চলেছে।

অরীন্দ্রবাবু বললেন, "ও রঙ-চঙে মলাটের বইটা কি উপেনবাবু ?"

আমার বাঁ পাশে বইটা প'ড়ে ছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললাম, "'ইয়েলো সিগন্যাল', ধূর্জটি অধিকারীর গল্পের বই।"

"ধূর্জটি অধিকারী ? কই, ও লেখকের নাম ত আগে শুনি নি !"

অপূর্ব বললেন, "আমিও শুনি নি।"

আমি বললাম, "না, এ ছাড়া ওঁর আর কোনো বই অথবা লেখার কথা আমিও জানি নে। বইখানা, আর তার সঙ্গে ধূর্জটিবাবুর একটা চিঠি কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি। চিঠিখানা প'ড়ে মনে বেশ একটু আঘাত পেয়েছিলাম।"

সকৌতূহলে অরীন্দ্রবাবু বললেন, "আঘাত পেয়েছিলেন ? কেন, বলুন ত ?"

চিঠিখানা বইয়ের মধ্যেই ছিল; বার ক'রে বললাম, "চিঠির একটা অংশ শুনলেই বুঝতে পারবেন, কেন। সে অংশটা এই—'এই বইখানিতে নানা ছাপার ত্রুটি থেকে গেছে। একটু ক্ষমাঘেন্না ক'রে বইখানা আদ্যন্ত পড়বেন এবং আপনার 'গল্প-ভারতী'তে একটু সমালোচনা করবেন—এই বিনীত অনুরোধ। কালব্যাধি—ক্যান্সার—টুঁটি চেপে ধরেছে। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। চিরবিদায়ের পূর্বে বইখানির সমালোচনা যদি প্রকাশিত হয় কিছুটা শান্তি লাভ করব।'

এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে নৈরাশ্যত্রাসপীড়িত এক চিত্তের যে নিবিড় ব্যঞ্জনা নিহিত, তার বেদনায় অপূর্বরতন ও অরীন্দ্রবাবু 'আহা!' 'আহা!' ক'রে উঠলেন।

বললাম, "চিঠির উত্তরে লিখেছিলাম,—'গল্প-ভারতী'তে পুস্তক-সমালোচনা হয় না; কিন্তু যেটুকু করব স্থির করেছি তা সমালোচনার

চেয়ে কম হবে না ব'লে বিশ্বাস করি। 'ইয়েলো সিগন্যাল' শুধু আদ্যন্ত পড়িই নি,—কতক-কতক প'ড়েও শুনিয়েছি। আপনার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, ক্যান্সারই হোক আর যা-ই হোক, আপনি সেরে উঠুন এবং লেখনী চালান। 'ইয়েলো সিগন্যালে'র প্রস্তুতি-পর্বের ইতিহাস জানতে ঔৎসুক্য হয়। একদিনে এ বস্তু হয় না।"

অপূর্ব বললেন, "আপনার এত ভাল লেগেছে দাদা ?"

বললাম, "শুধু আমারই ভাল লাগে নি ; যে দু-চার জনকে খানিক-খানিক পড়িয়ে শুনিয়েছি, সকলেরই ভাল লেগেছে। তোমাদের শোনালে তোমাদেরও ভাল লাগবে। বাংলা দেশের পাঠকসমাজ রসবোধহীন নয়, তার প্রমাণ বইখানি বহন করছে। ১৩৬২ সালের অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ; দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে মহালয়ার বেশি অপেক্ষা করতে হয় নি। যে দক্ষতা লেখক দেখিয়েছেন, তা উন্নত রসবোধের পরিচায়ক।···একটু শুনবে না কি ?"

অপূর্বরতন এবং অরীন্দ্রজিৎ উভয়েই আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

'ইয়েলো সিগন্যাল' পুস্তকে দুটি গল্প আছে—"ইয়েলো সিগন্যাল" এবং "কাক-জ্যোৎস্না।" 'কাক-জ্যোৎস্না' থেকে কয়েক পাতা প'ড়ে শোনালাম।

অরীন্দ্রবাবু এবং অপূর্বরতন দুজনেরই খুব ভাল লাগল।

পূর্বদিকের দেওয়ালে বিলম্বিত ক্লকের ছোট কাঁটা বারোটার অতিক্রম করেছিল।

অপূর্ব বললেন, "বারোটা বেজে গেছে দাদা, আপনার স্নানাহারের দেরি হয়ে গেল। এখন বৈঠক ভাঙা উচিত।"

বললাম, “আমার চেয়ে তোমার আহারের সময় বেশি নিয়মিত ; তোমারও ত দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা, আজ তা হলে এইখানেই ইতি দেওয়া যাক।”

উভয়ে প্রস্থান করলে ‘ইয়েলো সিগন্যাল’ ও ধূর্জটিবাবুর চিঠিটা তুলে রাখতে রাখতে মনে মনে প্রার্থনা করলাম, ধূর্জটিবাবুর রোগ-নির্ণয়ে চিকিৎসক যেন ভুল ক’রে থাকেন, আর একান্তই তা যদি না ক’রে থাকেন, ধূর্জটিবাবুকে সারিয়ে তোলবার চিকিৎসা যেন তাঁর অধিকারে আসে।

প্রত্যূষে মুখ-হাত ধুয়ে চা পান ক'রে কাগজ-কলম-মন নিয়ে লিখতে বসেছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ বিষ্ণু নাগের আবির্ভাব।

বহুবশ্চ বিঘ্নাঃ; আপাততত একটি। বললাম, "তার পর? কি মনে করে?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিষ্ণু নাগ নিজে এক প্রশ্ন করলে; বললে, "সকালবেলা কাগজ-কলম নিয়ে কি করছ?"

বললাম, "কি আশ্চর্য! লেখা ছাড়া কাগজ-কলম নিয়ে কে আবার কি করে?"

"একশ জনের মধ্যে পঁচানব্বই জন হিজিবিজি কাটে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললাম, "সেই পঁচানব্বই জনের মধ্যে তুমি আমাকে ফেলতে চাও নাকি?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিষ্ণু নাগ যে কথা বললে তার জোরে পঁচানব্বই জনের বাইরেও ঠিক পড়া যায় না; বললে, "ও ছাই-ভস্ম যা করতে হয় পরে ক'রো, তার আগে একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

বললাম, "তারও আগে আমি তোমার সঙ্গে অন্য একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "কি বল?"

বললাম, "বয়েস খানিকটা বেশি হ'য়ে গেছে ব'লে ভারি কুণ্ঠিত হয়ে আছি। সাধারণ লোকের ধারণা এ বয়সে মানুষ fossilised, অর্থাৎ প্রস্তরীভূত হ'য়ে যায়; দেহ অস্থি-পঞ্জরে পরিণত হয় ব'লে

তারা মনে করে, মনও পাথর হ'য়ে গিয়ে আর নতুন কিছু দেবার মতো থাকে না। তার ওপর তুমি যদি আমার লেখাকে ছাই-ভস্ম ব'লে ফতোয়া ছাড়, তা হ'লে দুপুরে দু-মুঠো অন্ন আর রাত্রে দুখানা রুটির পথও বন্ধ হবে।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "ক্ষেপেছ? তোমাকে যে fossilised মনে করে, সে নিজেই fossilised। তোমার 'মাটির পথ' উপন্যাসে সীমা ও দিলীপকে একটি কুপে কামরার মধ্যে বন্দী ক'রে যে দুর্দান্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতির অবতারণা করেছ, তার জন্যে যে-কোন আধুনিক লেখক তোমাকে বাহবা দেবে।"

মাথা নেড়ে বললাম, "না বিষ্ণু, বাহবা দেবে না; দুয়ো দেবে। বলবে, চমৎকার ভাবে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উপেন গাঙুলী শেষ রক্ষে করতে পারলে না; দিলীপকে রক্ত-মাংসের একটা সত্যিকারের বাস্তব মানুষ গ'ড়ে তোলবার অমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও সাহসের অভাবে শেষ পর্যন্ত তাকে সংযমের কুসংস্কার দিয়ে পুতুল বানিয়ে ছাড়লে!"

বিষ্ণু নাগ বললে, "সত্যি! আজকালকার তথাকথিত জীবন-শিল্পীরা শুধু নগ্নতার পেছনেই ব্যস্ত, আবরণের কোনো মহিমা তাদের কাছে নেই। কিন্তু যেদিন মানুষ আবরণ ফেলে দিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ তা তুলে নেবে, সেই প্রত্যাবর্তনের দিনেরও খুব বেশি বিলম্ব নেই। বস্তুসর্বস্ব বাস্তব-যুগকে গ্রাস করবার জন্যে রোম্যান্টিক যুগ ওৎ পেতে ব'সে আছে।"

বললাম, "গ্রাস করবার জন্যে ওৎ পেতে আছে কি-না বলতে পারি নে, তবে রোমান্স রীয়ালকে চিরদিনই জড়িয়ে আছে ও থাকবে, যেমন স্নায়ু-শিরা-উপশিরা চিরদিন অস্থি-মেদ-মাংসকে

জড়িয়ে আছে ও থাকবে। বাস্তবের অধিদেবতা যদি দেহ বল, তা হ'লে রোমান্সের অধিদেবতা মন। আর, দেহের মতো মনকে ওজন করবার পদ্ধতি জানা নেই ব'লেই মনকে বলব অবাস্তব, এ একটা কুসংস্কার; যদিও আমরা কথায় কথায় 'ভারি মন' 'হালকা মন'—এই ধরনের কথা ব'লে থাকি এবং তার অর্থও বুঝে থাকি।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "নানা রকম উপমা-উদাহরণকে আশ্রয় ক'রে বিষয়টা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে। যে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলাম, এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত সেটা না আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়।"

"তা হ'লে এ প্রসঙ্গ থাক্; সেইটেই না হয় আরম্ভ কর।" ব'লে অন্যমনস্কতা বশতঃ খুলে-রাখা কলমটা বন্ধ ক'রে রাখলাম।

কিন্তু আলোচনা আরম্ভ করবার সময় পাওয়া গেল না, নীচে রাজপথ হ'তে প্রশ্ন এল, "দাদা আছেন?"

অনিল ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর।

জানলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, "আছি বই কি। যায় কে? সোজা চ'লে এস ওপরে।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "কিছুদিন থেকে তুমি ছলে-ছুতোয় যাওয়ার কথা বলতে আরম্ভ করেছ; আর দিন দিন ও-বুলি বেড়েই চলেছে।"

"তার কারণ, দিন দিন আমার থাকার মেয়াদ ক'মে আসছে।"

"থাকার মেয়াদ ত প্রতিদিন সকলেরই ক'মে আসছে, কিন্তু তোমার মতো তা নিয়ে অত সরফরাজি ত কেউ করে না।"

"তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে, তোমার পরিচিত পরিধির মধ্যে ঠিক আমার মতো আর দুটি লোক নেই।"

বিষ্ণু নাগের দুই চক্ষে বিরক্তির ভ্রূকুটি দেখা দিল; ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "দেখ উপেন, কথা দিয়ে কথা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা ক'রো না। যতই মুখে বাহাদুরি কর না কেন, আমার বিশ্বাস, মনে মনে মৃত্যুকে তুমি রীতিমতো ভয় কর।"

বললাম, "আমারও বিশ্বাস, করি। তবে রীতিমতো ভয় বলতে কি তুমি বোঝাতে চাও যখন জানি নে, তখন রীতিমতো ভয় করি কি না তাও জানি নে।

"সংসারের সাধারণ গোলা লোকের মতো তোমারও সংসারের প্রতি আসক্তি আছে।"

"নেই?—যথেষ্ট আছে। সংসার ত বড় কথা, ঐ যে টেবিলের ওপর স্প্রীংয়ের কলিং বেলটা রয়েছে, যেটা নিয়ে অনেক সময়ে আমি নিজে খেলি আর নাতি-নাতনীদের খেলা দিই, একদিন আমি নীরব হ'য়ে যাব অথচ ওটা বোতাম টিপলেই বাজতে থাকবে—এ কথা ভাবলে সময়ে সময়ে সেই চিন্তার মধ্যে মনটা হায় হায় করতে থাকে।"

"তা হ'লে প্রকারান্তরে স্বীকার করছ, হাস্য-পরিহাসের দ্বারা মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার যে ভঙ্গি তুমি চালিয়েছ সেটা তোমার অন্তরের জিনিস নয়,—অভিনয়; সুতরাং তোমার মনের মধ্যে মহান্ কোনো বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার যে ভান তুমি কর, সেটা নিছক ছলনা।"

বিষ্ণু নাগের কথা শুনে না হেসে থাকতে পারলাম না; বললাম, "দেখ বিষ্ণু, আমার বিষয়ে খবরাখবর রাখবার সুযোগ অনেকের চেয়ে তোমার হয়ত কিছু বেশি থাকতে পারে, তাই ব'লে আমার সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ হবার দাবি যদি কর, তা হ'লে আপত্তি করব।

মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যদি দেখাই, অন্তরের সঙ্গেই তা দেখাই, অভিনয় করি নে। কিন্তু অভিনয়ই যদি করি, তা হ'লেও অন্যায় করি নে। কবি ব'লে গেছেন,—'বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে, প্রয়োজনকালে ঠিক সে থাকে'। প্রয়োজনকালে যুদ্ধটা যাতে ঠিকমতো হ'তে পারে সেই জন্যে শান্তির কালে mock-fight-এর ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধ অনিবার্য নয়, মৃত্যু কিন্তু অনিবার্য; সেই অনিবার্যকে অবহেলা ক'রে ভুলে থাকা উচিত নয়, সকলেরই তার সঙ্গে কিছু mock-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অভিনয় চালানো উচিত। তা হ'লে ঘটনাকালে মুমূর্ষু এবং শোকার্ত উভয় পক্ষের বেদনার আকস্মিকতা খানিকটা ভোঁতা মারতে পারে।···তোমার দ্বিতীয় মন্তব্যের বিরুদ্ধে বলতে চাই, আমার মনের মধ্যে মহান্ বৈরাগ্যের উদয় হ'য়ে আমি দ্বিতীয় এক শঙ্করাচার্য হয়েছি—এমন অভিমান আমার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু যা আছে তাকে একটা paradox বলতে পার। আসক্তি আর ঔদাস্য একসঙ্গে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। এ এমন এক আশ্চর্য, যার ব্যাখ্যা দিতে আমি অসমর্থ। কলিং বেলের প্রতি আমার আসক্তির কথা আগে বলেছি; কলিং বেলের তবু গোটা পাঁচেক টাকা মূল্য আছে; তার চেয়েও যে-পদার্থ অনেক বস্তুহীন—ঐ কাগজের বাক্সে গোটা কয়েক আলপিন—ওর প্রতিও আমার আসক্তি কম নয়। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে ওদের হারানোর মধ্য দিয়েও একটা বৃহৎ হারানোর রিক্ততায় কষ্ট পাই। অথচ বিশ্বকে দেখে সময়ে সময়ে মন ঔদাস্যে ধূসর হয়ে যায়;—মনে হয়, এই নিঃস্বত্ব অলীক প্রপঞ্চ থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! আর উৎসাহের সঙ্গে মনে মনে বলি,

মৃত্যু যেদিন বলবে, জাগো,
প্রভাত হ'ল তোমার রাতি ;
নিভিয়ে যাব আমার ঘরের
চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।"

"কি দাদা, কাব্যচর্চা করছেন?" ব'লে অনিল ঘরে ঢুকল। বিষ্ণু নাগকে দেখে বললে, "এই যে বিষ্ণুবাবু, কতক্ষণ এসেছেন?"

বিষ্ণু বললে, "তা খানিকক্ষণ এসেছি। কিন্তু আপনার পায়ে বাত হয়েছে না-কি?"

পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মাথা নেড়ে অনিল বললে, "বাত? না তো। খোঁড়াচ্ছিলাম না কি?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "খোঁড়াচ্ছিলেন কি না লক্ষ্য করি নি। অনুমান করছিলাম বাত ব'লে।"

"হঠাৎ বাতের অনুমান?"

"হঠাৎ নয় অনিলবাবু, ভেবে-চিন্তেই। মিনিট পনেরো আগে পথ থেকে সাড়া দিয়ে দোতলায় আসতে—"

হো-হো ক'রে অনিল হেসে উঠল; বললে, "তাই বাত বলছেন? বাতই বটে; তবে পায়ের বাত নয়, মুখের। নীচে দাদার ছেলেদেব সঙ্গে একটু বাতচিৎ হচ্ছিল।"

আসন গ্রহণ ক'রে আমার দিকে চেয়ে অনিল বললে, "আসবার পথে অপূর্বদাদার সঙ্গে দেখা হ'ল। বললেন, ডাঃ জ্ঞান মজুমদার নাকি ঝাড়া আধ ঘণ্টা আপনাকে সদুপদেশ দিয়েছেন। কি ব্যাপার বলুন ত?"

"অপূর্বর মুখে শোন নি?"

"না, আপনার মুখে শুনতে বলেছেন।"

বললাম, "আর বিড়ম্বনার কথা বল কেন? একদিন রাত্রে শরীরটা একটু বেভাব হাওয়ায় পরদিন সকালে ডাঃ পালকে ডাকিয়ে শরীর পরীক্ষা করালাম। দেখা গেল, শরীরের কল কোথাও কোথাও একটু বিগড়েছে। অপূর্ব আমাকে ডাঃ মজুমদারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাঃ পালের রিপোর্ট দেখে আর নিজেও কিছু পরীক্ষা ক'রে ডাঃ মজুমদার বললেন, সম্প্রতি কায়িক পরিশ্রম কিছু বেশি করার ফলে এমনটা হয়েছে। এখন আপনাকে কিছুদিন কায়িক পরিশ্রম কমাতে হবে।"

অনিল বললে, "রিজার্ভের থিয়োরি কি নাকি বলেছেন?"

বললাম, "হ্যাঁ, বলেছেন—আমাদের সকলের দেহে শক্তির একটা 'রিজার্ভ' থাকে। হঠাৎ কোনো কারণে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হ'লে সেই রিজার্ভের ওপর হাত পড়ে, তারপর আবার রিজার্ভ পূর্ণ হ'য়ে যায়। আমাদের বয়সে কিন্তু রিজার্ভ থেকে শক্তি খরচ হ'লে তা আর সহজে পূর্ণ হয় না। তাই আমাদের বয়সে রিজার্ভটা অটুট রেখে দিনার্জিত শক্তির দ্বারা যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকু কাজ করাই উচিত। তাই আমাকে কিছুদিনের জন্যে সভা-সমিতি বন্ধ রাখতে বলেছেন।"

অনিল জিজ্ঞাসা করল, "বন্ধ রাখবেন?"

বললাম, "সভা-সমিতিতে গেলে খারাপ শরীরেও আমি সুস্থ বোধ করি বলাতে ডাঃ মজুমদার একটা রফার মতো করেছেন; বলেছেন, সভা-সমিতিতে যাওয়ায় তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু আমি সভাপতি হ'তে কিংবা বক্তৃতা দিতে পারব না। আচ্ছা বল ত, এ ব্যবস্থা কতকটা 'শ্বশুর বাড়ি যেতে পারব, কিন্তু অন্দর মহলে শুতে পাব না'-র মতো ব্যবস্থা নয় কি?"

অনিল এবং বিষ্ণু নাগ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বউমার ঘরে রেডিয়োতে আধুনিক বাংলা গানের ঘোষণা শোনা গেল। বললাম, "আধুনিক বাংলা গানটা ভাল ক'রে শোনা যাক; তার পর আবার কথাবার্তা চলবে।"

বিস্মিত কণ্ঠে অনিল বললে, "হঠাৎ আধুনিক বাংলা গানের ওপর এত ঝোঁক কেন দাদা?"

বললাম, "কারণ আছে, পরে বলব।"

গান আরম্ভ হ'ল।

আধুনিক বাংলা গান শেষ হ'লে রেডিওতে বাংলা রাগপ্রধান গানের ঘোষণা শোনা গেল।

অনিল জিজ্ঞাসা করলে, "আধুনিক গান কেমন লাগল দাদা ?"

বললাম, "মন্দ না। কিন্তু একটা কথা বলতে পার অনিল,— আধুনিক বাংলা গানের পর রেডিওতে এবার যে বাংলা রাগপ্রধান গানটি ঘোষিত হ'ল, সেটির আধুনিক বাংলা গান ব'লে ঘোষিত হবার পক্ষে বাধা ছিল কোথায় ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে অনিল বললে, "সুরের গঠনপদ্ধতির মধ্যে। যে শ্রেণীর গানে আধুনিক বাংলা গান অপেক্ষা শাস্ত্রীয় রোগের প্রাধান্য বেশি, সেই শ্রেণীর গানকে রাগপ্রধান বাংলা গান বলা হয়। সুতরাং এই যে রাগপ্রধান বাংলা গানটি গাওয়া হচ্ছে, এটিকে আধুনিক বাংলা গান বললে স্বরসংগঠনের দিক দিয়ে এর কৌলীন্যকে ক্ষুণ্ণ করা হ'ত। আধুনিক বাংলা গানের সুরের মধ্যে রাগ মেশাবার যে পদ্ধতি, তাকে রাগপ্রধান বাংলা গান অসঙ্গত মনে করে।"

আমি বললাম, "ঠিক বলেছ। যতদূর মনে হয়, আধুনিক বাংলা গান বলতে সম্প্রতি আমরা যে বিশেষ ঠাটের গান বুঝি, তার উৎপত্তির আগে 'রাগপ্রধান' কথাটির চলন ছিল না। আবিষ্কার একান্তই যদি না ক'রে থাকে, কথাটিকে চলন্ত করেছে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর মনীষা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সব বাংলা গান টপ্‌পা খেয়াল ধ্রুপদের পর্যায়ে পড়ে না, অথচ শাস্ত্রীয় রাগের

আনুগত্য রক্ষা ক'রে চলে, তথাকথিত আধুনিক বাংলা গানের ছোঁয়াচ হ'তে তাদের রক্ষা করবার জন্যে রেডিও-কর্তৃপক্ষ তাদের নামকরণ করেছেন 'রাগপ্রধান'।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "কিন্তু ছোঁয়াচ হ'তে রক্ষা করবার জন্যে বলছ কেন? তুমি কি আধুনিক বাংলা গানকে অন্ত্যজ বলতে চাও?"

মাথা নেড়ে বললাম, "অন্ত্যজ বলতে নিশ্চয় চাই নে, কিন্তু অগোত্রজ বলব। মার্গ সঙ্গীতের যতগুলি গোত্র বর্তমান, আধুনিক বাংলা গান তার কোনোটিরই নয়। সুরের কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসে বেসুরের সঙ্গে সে গাঁটছড়া বেঁধেছে, সুতরাং গোত্র হারিয়েছে। এমন কি, আজ পর্যন্ত একটা নামের মতো নাম জোটাতে পারলে না। 'আধুনিক বাংলা গান' একটা নামই নয়। যে গান আজ বাংলা ভাষায় রচিত হ'য়ে পুরোদস্তুর বিশুদ্ধ রাগের দ্বারা সুরান্বিত হ'ল, সেও ত আধুনিক বাংলা গান; অথচ সে ত আর কুলহারা আধুনিক বাংলা নয়। কুলীন আধুনিক বাংলা গানের স্বতন্ত্র নামকরণ না ক'রে অকুলীন বাংলা গানের একটা কোনো বিশেষ নাম দিলে রেডিও-কর্তৃপক্ষ আরও ভাল কাজ করতেন।"

অনিল বললে, "আপনি একটা নাম দিন না।"

"আমি? আমি নাম দিলে জগৎ গ্রহণ করবে কেন?"

অনিল বললে, "জগৎ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, আমরা করব। আমাদের আলোচনার মধ্যে বারংবার সেই বিশেষ ঢঙের আধুনিক বাংলা গান না ব'লে মাত্র একটা শব্দ দিয়ে কাজ সারব। সেই শব্দটি আপনি আমাদের দিন।"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে বললাম, "ধর, যদি দিই—ঢপ্‌পা?"

"টপ্পা!" অনিলের মুখে অপছন্দসূচক নিঃশব্দ হাসি দেখা দিল,—"টপ্পার মানে কি দাদা?"

বললাম, "আপাতত কোনো মানে নেই; কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ করবে, সেই মুহূর্ত থেকে সেই অর্থ সঞ্চয় করতে থাকবে। ধান ভানবার কাঠের যন্ত্রকে প্রথম যে-দিন ঢেঁকি নাম দেওয়া হয়েছিল, তার পূর্বে ঢেঁকি শব্দের কোনো অর্থ ছিল না; কিন্তু আজ নিরক্ষর গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে ত কথাই নেই, শহরে আবদ্ধ পৌরজন, একমাত্র থালার ওপর ভাতের সঙ্গেই যার পরিচয়, তার কাছেও ঢেঁকির অর্থ অস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া, ঢপ্পা শব্দটি সঙ্গীত-পরিভাষার পক্ষে একেবারে অনাত্মীয় শব্দ হবে না। এর মধ্যে কীর্তনের ঢপ শব্দটি ত পুরোপুরিই আছে, টপ্পা শব্দের অপ্পাও আছে। বছর খানেক ব্যবহারের পরে ঢপ্পা টপ্পার আভিজাত্যই অর্জন করবে; আর, কানেও খারাপ ঠেকবে না। তখন হয়ত কোনো গানের আসরে খান তিনেক রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়ার পর হেমন্তকুমার নিজেই বলবেন, এবারে একটা ঢপ্পা গাই,—ব'লে হয়ত 'জীবনের নদীতটে' গানটা আরম্ভ করবেন।"

অনিল বললে, "হেমন্তকুমারের গাওয়া 'জীবনের নদীতটে' শুনেছেন?"

"শুনেছি বইকি।"

"কেমন লেগেছিল?"

"চোদ্দ গ্রেন চিনির সঙ্গে দু গ্রেন কুইনীন মিশিয়ে চাটলে যেমন লাগে, তেমনি। কি করবে হেমন্তকুমারের অমন সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠ, সুর যেখানে উৎকট?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "তোমার কানে উৎকট, কিন্তু অনেকের কানে হয়ত উৎকৃষ্ট। অনেক নতুন জিনিস প্রথমে, কানেই বল আর মনেই বল, উৎকট লাগে; তারপর অভ্যস্ত হ'তে হ'তে উৎকৃষ্ট হ'য়ে আসে।"

আমি বললাম, "এ সত্য তা, বলতে গেলে, বাল্যকাল থেকেই জানা আছে। কিন্তু যে-জিনিস প্রথমে উৎকট লেগে পরে উৎকৃষ্ট লাগে, তার মধ্যে উৎকৃষ্ট লাগবার একটা স্বাভাবিক ধর্ম বর্তমান থাকে। নিম অথবা উচ্ছের তিক্ততার মধ্যে অভ্যাসের ফলে মিষ্টি লাগবার সেইরকম একটা স্বাভাবিক ধর্ম আছে ব'লেই স্থক্তোয় ও-দুটি তেতোর যে-কোনো একটা না পড়লে স্থক্তো মিষ্টি লাগে না। কিন্তু নিম অথবা উচ্ছের পরিবর্তে স্থক্তোয় কুইনীন দিলে স্থক্তো তেতোই লাগে। স্থরের প্রত্যাশিত গতিতে চলতে চলতে অকস্মাৎ অসঙ্গত ভাবে বেস্থরো মেরে যাওয়ার ঢপ্‌পার কায়দা কুইনীন জাতীয় বস্তু। সম্ভবতঃ ঢপ্‌পায় ও-কায়দা আমদানি করা হয়েছে ইয়োরোপীয় সঙ্গীত থেকে। কিন্তু লাগসই করবার উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের উচ্ছে ঢপ্‌পায় এসে কুইনীনধর্মী হয়েছে। ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের উচ্ছে সৃষ্টি করে অপ্রত্যাশিতের বৈচিত্র্য; ঢপ্‌পার কুইনীন সৃষ্টি করে অসঙ্গতির বৈরূপ্য।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "ঢপ্‌পার কুইনীনের অসঙ্গতির বৈরূপ্য বলতে যা বোঝাতে চাচ্ছ, তার সঙ্গে ত খানিকটা পরিচয় আছে; ইংরিজী সঙ্গীত থেকে উচ্ছের অপ্রত্যাশাজনিত বৈচিত্র্যের কিছু আন্দাজ দিতে পার?"

বললাম, "তরুণ বয়সে ভাগলপুরে কুমার সতীশচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের মুখে ইংরিজী গান কিছু কিছু শুনেছিলাম। একটা গান মনে

পড়ছে, যার প্রথম দিকের কয়েক লাইনে একটা উচ্ছের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রথম দিকটা এইরকম,—I have a flower within my heart,—Daisy, Daisy! Whether she loves me or loves me not, Sometimes it's hard to tell। এই কয়েক লাইনের মধ্যে 'hard to tell'-এর 'to'-র ওপর একটি উচ্ছে আছে।"

অনিল বললে, "একটু সুর ক'রে না দেখালে উচ্ছেটি দেখতে পাচ্ছি নে দাদা।"

মনে মনে সুরটা একটু ভেঁজে নিয়ে বললাম, "সুর করলে কতকটা এইরকম শোনাবে,—

| র্সা | না | র্সা | ধা | প | া | মা | পা | া | মা | সা | া |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | have | a | flow | er | o | wi | thin | o | my | heart | |
| র্সা | া | া | পা | া | া | ধা | রা | া | া | া | া |
| Dai | o | o | sy | o | o | Dai | sy | o | o | o | o |
| ধা | ণা | ধা | পা | মা | পা | ধা | । | পা | রা | । | । |
| Whe | ther | she | loves | me | or | lo | ves | me | not | o | o |
| ধা | ণা | ধা | পা | । | দা | ধা | । | । | । | । | । |
| Some | time | it's | hard | | to | tell | o | o | o | o | o |

'Hard to tell' কথাগুলিতে 'পা-কোমল ধা-শুদ্ধ ধা'-র গায়ে গায়ে জড়ানো আদুরে সুর শুনে বিষ্ণু নাগ ও অনিল উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

অনিলকে সম্বোধন ক'রে বললাম, "উচ্ছে কেমন লাগল অনিল?"

অনিল বললে, "ভারি মিষ্টি লাগল। এবার ঢপ্‌পার কুইনীনের একটা নমুনা দেখান।"

বললাম, "কুইনীন এখনও ঠিক বরদাস্ত করতে পারি নে, তাই গেয়ে দেখাবার মতো মনে থাকে না। ওর ত যুক্তিগত কোনো চাল নেই, খানিকটা নিয়মানুগ চালে চলতে চলতে যতটুকু চড়বে ব'লে প্রত্যাশা করা যাচ্ছিল, তার পূর্বেই খাদে এক জায়গায় একটু বেসুরো মেরে থেমে গিয়ে গলা কাঁপাতে থাকা ওর প্রধান কৌশল। কিন্তু এই ট্যাস কৌশল ভাঙিয়ে আর কতদিন চালানো যায়, বল ?"

বিষ্ণু নাগ জিজ্ঞাসা করলে, "টঁ্যাস মানে ?"

"টঁ্যাস মানে দোআঁশলা, দিশী আর বিলিতীর মিশ্রণে উৎপন্ন।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "তুমি ত ঢপ্‌পার ওপর বিষম খাপ্‌পা হয়েছ দেখছি! কিন্তু আগে ত তুমি বেশ খানিকটা সহানুভূতিশীল ছিলে ?"

বললাম, "এখনও আছি। বাঙালীর প্রতিভা ঢপ্‌পার মধ্যে একটা নূতন কোনো অপরূপের সৃষ্টি করবে, সে প্রত্যাশা এখনও একেবারে হারাই নি, কিন্তু হতাশ হ'তে আরম্ভ করেছি। যে উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রথম দিন একটা এবড়ো-খেবড়ো মর্মর চাঙড়ের মধ্যে সুষমাময়ী নারীমূর্তি দেখতে পেয়েছিল, ঢপ্‌পার সুরকারদের মধ্যে সেই উদ্ভাবনী বুদ্ধির অভাবে ঢপ্‌পার সুর-বিকাশ এ পর্যন্ত সুরের চাঙড় হ'য়েই রয়েছে।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "কিন্তু তুমি বোধ হয় লক্ষ্য কর নি, আজকাল ঢপ্‌পা জনপ্রিয় হ'তে আরম্ভ করেছে। আগে যারা ঢপ্‌পার বিজ্ঞপ্তি শুনলে রেডিওর চাবি বন্ধ করত, আজকাল তারা চাবি বন্ধ না ক'রে কান পাততে আরম্ভ করেছে।"

বললাম, "আমিও কান পাততে আরম্ভ করেছি, কিন্তু ঢপ্‌পা কানে মিষ্টি লাগতে আরম্ভ করেছে ব'লে নয়, ঢপ্‌পা ক্রমশ

রাগপ্রধান হ'য়ে আসছে ব'লে। উৎকট স্থরের তেজ-দর্পে সাবেকী সঙ্গীতের ঘর ছেড়ে টপ্‌পার বেরিয়ে যাওয়া, রাগ ক'রে বউয়ের বাপের বাড়ি যাওয়ার মতো। রাগভঙ্গে বউয়ের ফিরে-আসার পালকি দেখা গেছে, তাই শ্বশুর-শাশুড়ী ভাস্থর-দেওর ননদ-জার দল উৎফুল্ল হ'য়ে দোর খুলেছে।"

হাসিমুখে অনিল বললে, "আবার রাগপ্রধান টপ্‌পা নামে আর একটা নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করলেন দাদা?"

উত্তর দিলাম, "আমি করি নি, স্থরকাররাই করেছেন। রেডিওতে প্রদ্যোতনারায়ণ 'একটি গানের মাঝে দুজনে মিলায়ে আছি' ব'লে যে গানটি গেয়েছিলেন, সে গানটিকে টপ্‌পা যদি বল, তা হ'লে আমি বলব রাগপ্রধান টপ্‌পা; কারণ সেই অতি উঁচু চালের গাওয়া গানটির মধ্যে টপ্‌পার বৈশিষ্ট্যকে রাগের প্রাধান্য দাবিয়ে দিয়েছিল। গানটির মধ্যে প্রদ্যোতনারায়ণ অল্প-স্বল্প তানও মেরেছিলেন। উগ্রচালের জাত টপ্‌পার মধ্যে তান মারা চলে না। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'কে তুমি আমারে ডাক' গানটিকেও আমি রাগপ্রধান টপ্‌পা বলব। ও-গানটি যখনই আমাদের গ্রামোফোনে বাজে, আমি কান পেতে থাকি। ভাল গাওয়ার ফলে গানটি অতি স্থশ্রাব্য হয়েছে। যে স্কেলে সন্ধ্যা এই গানটি গেয়েছেন সেইটেই তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক স্কেল; সেই জন্যে স্থরের ওপর আবদারই বল, আর দরদই বল, ঠিকমতো বসতে পেরে উঁচুদরের মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাঁর গাওয়া 'সে গান আমি যাই যে ভুলে' গানটি তিনি অসঙ্গত চড়া স্কেলে গেয়েছেন; তার ফলে অমন দরদী কণ্ঠ স্থরের উপর অধিষ্ঠিত হবার বাগ পায় নি, চড়া স্থরকে স্থরে বজায় রাখতে রাখতেই সব দম শেষ হয়েছে। অমন মেম-

সাহেবী মিহি গলার বদলে সন্ধ্যারাণীর স্বাভাবিক কণ্ঠের অপরূপত্ব হারাতে, আমি অন্তত, রাজি নই। আজকের মতো ঢপ্‌পার প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করা যাক, অন্য কথা আছে।”

বিষ্ণু নাগ বললে, “কিন্তু ঢপ্‌পা নামকরণ যখন করলে, তখন ঢপ্‌পা বলতে ঠিক কোন্ বস্তু বোঝাচ্ছ, তার একটা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত তোমার।”

বললাম, “সে সংজ্ঞা ত ঢপ্‌পার বিষয়ে আলোচনার মধ্যে আপনিই গ'ড়ে উঠেছে ; তবুও যদি কাটা-ছাঁটা একটা সংজ্ঞা চাও ত বলব—ঢপ্‌পা হচ্ছে অতি আধুনিক কালে উৎপন্ন সেই চালের গান, যে গানের সুরের চোদ্দ আনা সুরে গাওয়া, এক আনা বেসুর মারা, আর বাকি এক আনা বিবিধ, যার মধ্যে কিছু কিছু ইয়োরোপীয় সঙ্গীত থেকে ধার করা। এই ধার-করা এক আনার মধ্যে আছে পুরুষ-গায়কের গলা-কাঁপানো, স্ত্রী-গায়িকার সুরে-হাঁপানো, আর স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষে গানের শেষে শেষ কথার শেষে স্বরবর্ণটিকে আশ্রয় ক'রে খানিকক্ষণ চেঁচিয়ে থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া।”

উচ্চহাস্যে কক্ষ চকিত হ'য়ে উঠল।

অনিল বললে, “গলা-কাঁপানো বুঝি ; কিন্তু সুরে-হাঁপানো কি ব্যাপার দাদা ?”

বললাম, “ও একটা সাম্প্রতিক কায়দা, যা সাধারণত মেয়েদের-গাওয়া গানেই শোনা যায়। ওটা হচ্ছে একটা কোন সুরের ওপর দাঁড়িয়ে অল্পক্ষণ ধ'রে হাঁপানো। মেয়েদের গলায় ও-জিনিস তবু খানিকটা মানায়, পুরুষকণ্ঠে একেবারেই না। কিছুদিন আগে একজন পুরুষ গায়ককে তাঁর গানের মধ্যে অবিরত হাঁপাতে দেখে

লজ্জায় আমার নিজের গায়েই কাঁটা দিয়েছিল। তিনি হয়ত মনে করেছিলেন হাঁপিয়েই বাজিমাৎ করবেন, কারণ সন্ধ্যারাণীর কয়েকটি বাজিমাৎ-করা গানে হাঁপানো আছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, পূর্বোক্ত 'কে তুমি আমারে ডাক' গানে 'মনে ত পড়ে না' অংশের 'না'-র ওপর বেশ একটু হাঁপানো শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা সকলেরই বোঝা উচিত, যা সন্ধ্যারাণীর কণ্ঠে সেজেছে, তা যে প্রদোষকুমারদের কণ্ঠেও সাজবে, তার কোনও মানে নেই। 'যাহার ঢলঢল নয়ন-শতদল তারেই আঁখিজল সাজে গো'—এই বাক্যটুকুর মধ্যে কবি যে সদুপদেশ দিয়ে গেছেন, তা মেনে চললে অনেক লজ্জার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।"

আমার কনিষ্ঠা কন্যা বাসনা এসে বললে, "বাবা, উষা বিশ্বাস তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"কোথায় আছেন তিনি ?"

"নীচে বৈঠকখানায় মার সঙ্গে কথা কইছেন।"

অনিল বললে, "আচ্ছা, অল্প-একটু পরে নিয়ে এসো।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, "টপ্পা গানের ভাষা আর ভাব সম্বন্ধে কিছু বললেন না ত দাদা ?"

বললাম, "ও দুটি বিষয়ে আমি প্রায় অকুণ্ঠ প্রশংসাই করতে পারি। যত গান আমি শুনেছি, তার প্রায় সবগুলির ভাষা সহজ-সুন্দর ; ভাব আধুনিক কবিতার মতো অনর্থকভাবে দুরূহার্থক নয়, বেশ প্রসন্ন-মধুর লিরিকধর্মী। তবে টপ্পা গানের কবিদের বিরুদ্ধে আমার সামান্য একটা অভিযোগ আছে। তাঁদের গানে সূর্যমুখী ফুলকে নিয়ে তাঁরা হঠাৎ একটু বেশি রকম মাতামাতি লাগিয়েছেন। তাঁদের কাব্যে অকস্মাৎ সূর্যমুখীর সৌভাগ্যের তারা তুঙ্গী হয়েছে।

আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'হৃদয় আমার সুন্দর তব পা-য়' গানের সঞ্চারীর মধ্যে 'হৃদয় আমার সূর্যমুখীর মতো মুখপানে তব চেয়ে চেয়ে রয় অবিরত' বেশ লেগেছিল। তারপর, গানের পর গানে সূর্যমুখী যে রকম প্যাঁট-প্যাঁট ক'রে চেয়ে থাকতে আরম্ভ করেছে, তাতে বলতে ইচ্ছে হয়, 'সূর্যমুখী লো, চোখ বুজে রও বুজে রও আপাতত'।"

একটা উচ্চহাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

বাসনা পুনরায় এসে জিজ্ঞাসা করলে, "এবার নিয়ে আসব কি তাঁকে?"

"হ্যাঁ, নিয়ে এসো।" ব'লে দাঁড়িয়ে উঠে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনিল জিজ্ঞাসা করলে, "ঊষা বিশ্বাস কে দাদা?"

বললাম, "ঊষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি—ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্‌ অফ্‌ স্কুল্‌স্‌। কিন্তু আসল পরিচয় সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ, আর পড়াশোনাও বেশ আছে।"

ক্ষণকাল পরে হাসিমুখে কক্ষে প্রবেশ করলেন ঊষা বিশ্বাস।

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' কয়েক দিন হ'ল গত হয়েছে। সুতরাং মহাকবি কালিদাসের সূত্র অনুসারে 'সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর স্তড়িৎ-পতাকোঽশনিশব্দ মর্দলঃ' সঙ্গে নিয়ে রাজসমারোহে বর্ষারাণীর এসে যাবার কথা। কিন্তু কোথায় শীকরমাখা মেঘের মত্তহস্তী, কোথায় তড়িৎরূপী পতাকা, আর কোথায়ই বা অশনিনির্ঘোষের মাদল? এ যে একেবারে মধ্য নিদাঘের 'অসহ্যবাতোদ্‌গত রেণুমণ্ডলা প্রচণ্ড সূর্যাতপতাপিতা মহী'!

মহীর কথা ঠিক বলতে পারি নে, তবে প্রচণ্ড সূর্যাতপের দ্বারা তাপিত হ'য়ে আমাদের কলিকাতা নগরী একটি চিতা হ'য়ে উঠেছে, যার গর্ভে সৎকার চলেছে চল্লিশ লক্ষ প্রাণীর। শেষ রাত্রি থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত তবু ওরই মধ্যে একটু ঠাণ্ডা থাকে, তারপরই আরম্ভ হ'য়ে যায় ক্রুদ্ধ মার্তণ্ডের অগ্নিক্ষরী দাপট।

বেলা তখন ন'টা। জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিষ্ণু নাগের সঙ্গে আলগা ধরনের আলোচনা চলছিল।

আমি বললাম, "তুমি যে-কথা বলছ তা আমি অস্বীকার করি নে, কিন্তু যতটুকু বস্তু থাকবে ততটুকুই বাস্তব, তার ওপর এক ছটাকও নয়, বস্তুর এতখানি মহিমাও আমি স্বীকার করি নে। আমাদের শ্যামপুকুরের কামিনী বসুর দেহে রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা নিয়ে প্রায় মণ-আড়াই বস্তু আছে; কিন্তু সেই বস্তু থেকে কামিনী বসু কিছু কমিয়েছে নাপিতের কাঁচির সাহায্যে মাথার চুল তের-আনা-তিন-আনা হারে ছাঁটিয়ে, আর নিজের ক্ষুরের সাহায্যে

প্রুশীয়ান স্টাইলে গোঁপ কামিয়ে। এর দ্বারা ওজনের দিক দিয়ে কামিনী বসুর বস্তুভার, তা সে যত সামান্যই হোক, কিছু কমেছে তা স্বীকার করবে ত ?"

স্মিতমুখে বিষ্ণু বললে, "স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।"

বললাম, "বস্তু কমেছে, কিন্তু চুল এবং গোঁপের দ্বারা রূপায়িত হ'য়ে তার বাস্তবতা স্ফুটতর হয়েছে। কামিনী বসু যে ন্যালাক্ষ্যাপা গোবেচারা ধরনের মানুষ নয়, তা বোঝা গেছে তার মাথার চুল আর প্রুশীয়ান গোঁপের দ্বারা।"

বিষ্ণু নাগ হাসতে লাগল। বললে, "তোমার এই উদ্ভট উপমাযুক্ত কথা শুনতে মন্দ লাগল না, কিন্তু এর প্রকৃত ব্যঞ্জনা কি, সেটা এখনও অস্পষ্ট রয়েছে।"

বললাম, "কিন্তু এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক Ralf Fox যে কথা বলেছেন তা তোমাকে শোনালে আমার কথা বোধ হয় খুব অস্পষ্ট থাকবে না।"

পাশে বইয়ের সেল্‌ফ্‌। তা থেকে Ralf Fox-এর The Novel and the People বইখানা টেনে নিয়ে প্রাসঙ্গিক জায়গাটা বার ক'রে বিষ্ণু নাগের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "আমি পড়ব, না, তুমি পড়বে ?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "তুমিই পড়, শুনি।"

আমি পড়তে লাগলাম, "Art is one of the means by which man grapples with and assimilates reality. On the forge of his own inner consciousness the writer takes the white-hot metal of reality and hammers it out, refashions it to his own purpose, beats it out

madly by the violences of thought. বাস্তবের কাঁচামালের ধাতুকে গন্‌গনে ক'রে তাতিয়ে অন্তরের কামারশালায় নিয়ে গিয়ে চিন্তার হাতুড়ি দিয়ে দুর্দান্তভাবে পিটিয়ে নিজের মনের মতো ক'রে পুনর্গঠিত ক'রে নেবার কথা বলেছেন র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স; আমি বলেছি কামিনী বসুর বাস্তবের কাঁচা মালকে হাতুড়ি পেটার পরিবর্তে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে আর ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে রূপান্তরিত করবার কথা।·· শিল্পপদার্থ মাত্রেই কৃত্রিম, কিন্তু তাই ব'লে অবাস্তব নয়।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "এখন আর তোমার বক্তব্য অস্পষ্ট নেই। খাদ্যশিল্প রসগোল্লা যখন গাছে ফলে না তখন তা নিশ্চয় কৃত্রিম বস্তু, কিন্তু তাই ব'লে তাকে যে অবাস্তব বলে তার রসজ্ঞান নেই।"

বিষ্ণু নাগের কথায় আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

আমি বললাম, "জীবনের গর্ভকোষ থেকে কথা-সাহিত্যের উৎপত্তি, তাই ব'লে সাহিত্য নিছক জীবন নয়। কথা-সাহিত্য সব সময়ে জীবনকে অনুসরণ করে, কিন্তু সব সময়েই জীবনকে অনুকরণ করে না।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "কিন্তু কথা-সাহিত্যের মধ্যে জীবনের জাদু না থাকলে, সাহিত্য প্রাণবন্ত হয় না।"

বললাম, "কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনের জাদু বলতে যে বস্তু বোঝাচ্ছ, তা আদত জীবনের মধ্যে খুব সুলভ নয়; জীবনের অলি-গলি বন-বাদাড় থেকে তা খুঁজে-পেতে বেছে-বুছে নিতে হয়; এমন কি, রসবোধ দিয়ে সৃষ্টি করতেও হয়। চোখ দিয়ে যা দেখলাম, কান দিয়ে যা শুনলাম, শুধু তারই ওপর মূলধন করলে কারবার ফলাও করা যায় না।"

"আসতে পারি?"

চেয়ে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে শ্রীমান্ দেবেশ অল্প অল্প হাসছেন।

সাগ্রহে বললাম, "আরে, এস, এস। নিশ্চয় আসতে পার।"

দরজার দু-পাশের চৌকাঠ ধ'রে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে দেবেশ বললেন, "আসব ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে যে-রকম দুরু দুরু ক'রে বুক কেঁপেছিল, আজও প্রায় সেইবকম কাঁপছে।"

বললাম, "তোমার বুক-কাঁপা অবশ্য কোনো সাময়িক উত্তেজনার জন্যে, হার্টের দোষে নয়; তবুও হৃৎকম্প জিনিসটা—একমাত্র ডার্বির ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া ছাড়া—মোটের উপর ভাল নয়। ভেতরে এসে ব'স।"

ভিতরে প্রবেশ ক'রে বিষ্ণু নাগকে দেখে আমার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে দেবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি?"

বললাম, "আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীবিষ্ণু নাগ।" বিষ্ণু নাগের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "ইনি আমার একান্ত প্রিয়জন শ্রীমান্ দেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস, দিল্লীর একজন উঁচু-দরের রাজকর্মচারী। কিন্তু আমার কাছে ইনি আরও উঁচু-দরের সাহিত্যিক আর সাহিত্য-অনুরাগী।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "আমার কাছেও ইনি তাই। আমি এঁর লেখার অনুরাগী পাঠক।"

দেবেশ বললেন, "আমি আজ আপনাকে প্রথম দেখলাম বিষ্ণুবাবু, কিন্তু 'শেষ বৈঠক' প'ড়ে আপনার যেটুকু পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে আপনার বিষয়ে আমার বেশ-খানিকটা কৌতূহল ছিল। এখন কিন্তু সেই কৌতূহলের সঙ্গে যৎসামান্য উদ্বেগও যোগ দিলে।"

তীক্ষ্ণনেত্রে দেবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিষ্ণু নাগ বললে, "কৌতূহলের কথা না হয় থাক্, কিন্তু উদ্বেগ যোগ দিলে কেন ?"

হাসিমুখে দেবেশ বললেন, "উপেনদা বললেন, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। অন্তরঙ্গ হ'য়েও মাঝে মাঝে আপনি উপেনদার ওপর যে-রকম নির্মমভাবে চড়াও হন, তাতে যারা আপনার অন্তরঙ্গ নয় তাদের ত একটু উদ্বিগ্ন হবারই কথা।"

একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

আমি বললাম, "বেশি অন্তরঙ্গ হ'লেই বেশি নির্মম হওয়া যায় দেবেশ। তুমি যখন বিষ্ণুর অন্তরঙ্গ নও, তখন তোমার উদ্বেগের কারণ নেই। কিন্তু সে কথা যাক্, ত্রিশ বৎসর আগে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে তোমার বুক কেঁপেছিল কেন বল ত ?"

দেবেশ বললেন, "ত্রিশ বৎসর আগে উত্তর-ভারত ঘুরে এসে ভ্রমণ-কাহিনীর পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের নিয়মিত লেখায় গৌরবান্বিত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পনের বৎসর বয়সের বালক দেবেশের বুক কেঁপেছিল, লেখাটির কি গতি হবে ভেবে।"

"সদ্‌গতি হয়েছিল নিশ্চয়ই ?"

"তা হয়েছিল।"

"তবে আজ কাঁপছিল কেন ? কাঁপবার কারণের ত শেষ হয়েছিল ত্রিশ বৎসর আগেই।"

"আজ কাঁপছিল আমার 'রক্তরাগ' উপন্যাস, যা একান্তভাবে আপনার প্রেরণাতেই লেখা,—আপনি তার কেমন সমালোচনা করলেন, তাই ভেবে।"

বললাম, "কাগজে-কলমে এখনো সমালোচনা করি নি ; আর

করবার কোনো প্রয়োজন আছে ব'লেও মনে করি নে, কারণ বহু কাগজেই 'রক্তরাগে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে। কিন্তু মুখে মুখে আমি তোমার 'রক্তরাগে'র যে-রকম আর যতটা সমালোচনা করেছি, লিখিত সমালোচনার চেয়ে তার মূল্যও কম নয়।"

বিষ্ণু নাগ বললে, "'রক্তরাগ' লিখতে তুমি দেবেশবাবুকে প্রেরণা দিয়েছিলে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দেবেশই দিলেন; বললেন, "হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। একদিন আমি—"

দেবেশকে বাধা দিয়ে বললাম, "দেখ দেবেশ, প্রেরণা দেওয়া সহজ, কিন্তু লেখা শক্ত। একজন বাজে লেখককে প্রচুর প্রেরণা দিলেও সে আবর্জনারই সৃষ্টি করে। 'রক্তরাগ' লেখবার যার নিজের শক্তি আছে, শুধু সে-ই লিখতে পারে 'রক্তরাগ'।"

দেবেশ বললেন, "আমি কিন্তু ঠিক সেই সাধারণ প্রেরণা দেওয়ার কথা বলছিলাম না। একদিন আমি আপনার কাছে দুঃখ করছিলাম, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারীরূপে সামরিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-সংযোগের নাছোড় দায়িত্ব কেমন ক'রে নিশ্ছিদ্র কর্মভারের গুরুচাপ দিয়ে আমার জীবনের রস শুষে নিচ্ছিল; কেমন ক'রে আমার সত্তা অপচিত হচ্ছিল জার্মান-জাপানী-ইটালীয়ান রাজবন্দীদের তত্ত্বাবধান ক'রে, আর যুদ্ধ-দপ্তরের বাঁধা আর হঠাৎ-উৎপন্ন হাজারো-রকম কর্তব্যের নটখটির মধ্যে; যার ফলে চাকরি-জীবনের গ্লানিকে অতিক্রম ক'রে আর কিছু না করতে পারার নৈষ্ফল্যে মন হয়ে উঠেছিল নিষ্ক্রিয়। শুনে আপনি দিয়েছিলেন প্রেরণা; বলেছিলেন—দেখ, কথায় বলে, যে মাটিতে পড়ে লোকে

ওঠে তাই ধ'রে। তুমিও তোমার এই সুদুর্লভ সামরিক পরিবেশের কঠোর আসনে ব'সে জোর তপস্যা লাগাও,—একটি যুদ্ধ-উপন্যাস রচনা কর।"

দেবেশকে অনুসরণ ক'রে আমি বললাম, "তোমার সেই জোর তপস্যার ফলে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে একটি অনন্যসাধারণ সম্পদ, আর সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য পেয়েছে এই প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পরিবেশে লেখা উপন্যাস—কথা-সাহিত্যের অগ্রগতির পথে একটি সার্থক দিক্‌চিহ্ন। আর সেই দিক্‌চিহ্নকে বলিষ্ঠ মূল্য-স্বীকৃতি দিয়েছেন ভারতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ 'রক্তরাগে'র ভূমিকা বাংলা ভাষায় লিখে।"

সেল্‌ফে 'রক্তরাগ' উপন্যাসের বিচিত্র প্রচ্ছদের একটু অংশ দেখা যাচ্ছিল। বইটা টেনে নিয়ে বললাম, "ভূমিকার এই অংশটা প'ড়ে শোনাই,—'এই বই সামরিক পটভূমিকায় উপন্যাসের রূপে লেখা হয়েছে। সামরিক জীবন সর্বসাধারণের একরকম রহস্য হ'য়ে আছে। সেই জীবনের উপর এই বই আলোকপাত করছে। আমি আশা করি যে এতে দেশ এবং বিশেষ ক'রে আমাদের সৈনিকেরা কিছু দিক্‌দর্শন পাবেন। আর খাঁটি সৈনিকের আদর্শ তাঁদের সামনে প্রতিভাত হবে।'…তুমি নিশ্চয় জান বিষ্ণু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলেজ-জীবনে বাংলা দেশের ছাত্র ছিলেন,—তাই লিখতে পড়তে বলতে প্রায় বাঙালীর মতই পারেন?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "জানি।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেবেশ বললেন, "এগারোটার সময়ে

একজনের সঙ্গে দেখা হবার কথা ; তার আগে আর একটা কাজ সারতে হবে। আজ উঠি, আর একদিন আসব।”

বললাম, “এস।”

দেবেশ প্রস্থান করলে পুনরায় বিষ্ণু নাগের সঙ্গে জীবন ও সাহিত্যের আলোচনায় রত হলাম।

## ২১

সকাল আটটা।

চা পান করতে করতে অনিল ভট্টাচার্য ও আমি রুচির পরিবর্তন সম্বন্ধে আল্‌গা আলোচনা করছিলাম।

অনিল বললে, "কিন্তু দাদা, মানুষের মন যতদিন পরিবর্তনশীল থাকবে, রুচির পরিবর্তনকে ঠেকনো যাবে না। মনই ত পরিবর্তন ঘটায়।"

আমি বললাম, "রুচির পরিবর্তনকে শুধু ঠেকানো যাবে না তাই-ই নয়, ঠেকাতে চায় নাও কেউ। কিন্তু পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে মানুষের দুটি মন আছে—এক, বিলম্বিত চালের সতর্ক মন; আর, দ্রুত চালের খেয়ালী মন। বিলম্বিত চালের সতর্ক মন রসবোধের মন্থর পদ্ধতির দ্বারা যে পরিবর্তন ঘটায় তার মধ্যে থাকে সুরুচির সৌষ্ঠব,—আর দ্রুত চালের খেয়ালী মন, একমাত্র পরিবর্তনস্পৃহার বশবর্তী হ'য়ে যে পরিবর্তন ঘটায়, তা, নিতান্ত দৈবক্রম ব্যতীত, হয় উৎকট হয়, নয় কুৎসিত।"

উত্তরে অনিল বললে, "কিন্তু খেয়াল ত মনেরই একটা ধর্ম,—কল্পনার বিকাশেরই একটা রকম-ফের।"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই; কিন্তু সে কল্পনা-বিকাশের একটা রসবোধের পৃষ্ঠপোষকতা থাকা চাই। শিল্পী নন্দলালের প্রখর রসবোধের অবলীলা আছে ব'লে তিনি যদি নিতান্ত খেয়ালের বশবর্তী হ'য়েও রঙ আর তুলি নিয়ে হিজিবিজি কাটেন, তার মধ্যেও একটা সুরুচির লীলা থাকে। আমি যদি সেই একই তুলি আর রঙ

নিয়ে হিজিবিজ কাটি, সেটা হয় নিছক হিজিবিজি। উৎকট খেয়ালের একটা দৃষ্টান্ত দিই। সম্প্রতি কিছুকাল থেকে কোন কোন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত কোন কোন বইয়ের প্যারাগ্রাফ সাজানোর মধ্যে এক অতি কদর্য রীতির চলন আরম্ভ হয়েছে। একটি প্যারাগ্রাফ থেকে অপর প্যারাগ্রাফের স্বাতন্ত্র্য দেখানোর সুদীর্ঘকাল থেকে আচরিত রীতি হচ্ছে লাইনের বাম প্রান্তে সামান্য একটু ফাঁক রেখে প্যারাগ্রাফের প্রথম লাইনের সূত্রপাত করা। এই রীতির দ্বারা আমরা দৃষ্টিপাত মাত্রই একটি নতুন প্যারার অর্থাৎ নতুন চিন্তার, কিংবা নতুন তত্ত্বের, কিংবা নতুন তথ্যের সূত্রপাত দেখতে পাওয়ার আরাম লাভ করি। আলোচ্য পদ্ধতিতে তার উপায় নেই। নতুন প্যারা আরম্ভ হয় প্রথম লাইনের বাঁ দিকের ফাঁকটুকু একেবারে অক্ষরের মাটি দিয়ে ঠেসে বুজিয়ে ফেলে। নতুন প্যারা বোঝাবার জন্যে নতুন প্যারার সূত্রপাতে কোনো ইঙ্গিত থাকে না; থাকে নতুন প্যারার শেষ লাইনের দক্ষিণতম প্রান্তে একটু ফাঁক বেখে। অর্থাৎ নতুন প্যারারূপ জন্তুটিকে চিনতে পারা যায় তার মুখ দেখে নয়, ল্যাজ দেখে।”

মন্তব্য শুনে অনিল হেসে বললে, “এ বিষয়ে আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত।”

আমি বললাম, “কতখানি অবৈজ্ঞানিক এই প্রথা একবার ভেবে দেখ অনিল। পূর্বপ্রথায় কম্পোজিটার প্যারাগ্রাফের প্রথম লাইন আরম্ভ করবার আগে এক এম্ (em) বল, আধ এম্ বল, অল্প একটু জায়গা খালি রেখে একেবারে প্যারাগ্রাফের শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে কম্পোজ ক'রে যায়। তারপর শেষ লাইনের ডান দিকে খানিকটা খালি জায়গা থাকুক আর নাই থাকুক, তা নিয়ে মাথা

ঘামাবার কোনো দরকার হয় না তার। কিন্তু এই নতুন পদ্ধতির প্যারা সাজানোয় প্যারাগ্রাফের শেষ লাইন যদি দৈবক্রমে লাইনের সব জায়গাটি অধিকার ক'রে বসে,—অর্থাৎ, নতুন প্যারাগ্রাফের সব মালটুকু (matter) যথাযথভাবে কম্পোজ হ'য়ে প্যারাগ্রাফ শেষ-হওয়া-সূচক একটু খালি জায়গা যদি না প'ড়ে থাকে, তা হ'লে উদ্ভব হয় এক সমস্যার। তখন হয় শেষ লাইনের স্পেস্ (space) তুলে নিয়ে নিয়ে ঠাসাঠাসি ক'রে সেই লাইনেই একটু জায়গা বার করতে হয়, নয় আরও কতকগুলো স্পেস্ ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে লাইনের অল্প একটু অংশ নিয়ে যেতে হয় পরবর্তী লাইনে। অথবা লেখকের কাছে প্রুফ পাঠিয়ে লিখতে হয়,—'মশায়, এমন বে-হিসেবী ভাবে ১১নং প্যারাটি রচিত করেছেন যে, মালটি কম্পোজ ক'রে শেষ হ'ল শেষ লাইনের একেবারে সমস্ত স্থানটি জুড়ে। এখন দয়া ক'রে ১১নং প্যারার শেষে কয়েকটি শব্দ যোগ করুন অথবা বাদ দিন, যাতে পর পর দুটি প্যারা এক হ'য়ে মিশে গিয়ে বিভ্রম ঘটাতে না পারে।' আচ্ছা, বল ত অনিল, এতখানি হাঙ্গামা বরণ ক'রে লাভ হ'ল কোথায় আর কতখানি ?"

অনিল বললে, "লাভ হ'ল বোধ হয় একটা নতুন কিছু করার।"

উত্তরে বললাম, "নতুন কিছু করলেও ত একটা কথা ছিল। আমার মনে হয়, এ তাও নয় ; এ নিতান্তই পরানুবৃত্তি। বিলেত থেকে অথবা আমেরিকা থেকে একটা বই ওই কায়দায় ছাপা হ'য়ে এল, অতএব নিশ্চয়ই ওর মধ্যে একটা বেশ-কিছু 'ইয়ে' আছে ; সুতরাং ছাপো বই ওই কায়দায়। 'ইয়ে'টা যে 'কিয়ে', তা বুঝে দেখবার ধৈর্য নেই,—এমনিই আমরা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা-রুচি পরহস্তগত ক'রে রেখেছি। তারপর, সৌষ্ঠবের দিক থেকে যদি

কিছু লাভবান হওয়া যেত, তা হ'লেও একটু যা হোক সান্ত্বনার কথা থাকত। সে দিকে ত একেবারে রম্ভা! প্রত্যেক পাতার খাঁদা-বোঁচা বাঁ দিক দেখলে হঠাৎ মনে হয়, কে বুঝি লম্বালম্বিভাবে কাঁচি চালিয়ে প্যারা-সূচনার ফাঁকগুলির অংশ কেটে দিয়ে নিরেট পাঁচিল গেঁথে দিয়েছে। যেখানে ভাষার মধ্যে ভাব ও চিন্তার পরিবর্তন-লীলা চলেছে, সেখানে ভাষা-বিন্যাসের এমন ঠাস্‌বুনোনি থাকলে দম বন্ধ হ'য়ে আসে, তার মধ্যে প্রবেশ করতে মন উৎসাহ পায় না। যদি আমার অজ্ঞাতসারে আমার কোনো বই এই অবৈজ্ঞানিক অসুন্দর কায়দায় ছাপা হ'য়ে যায় তা হ'লে আমি কি করব জান?"

সকৌতূহলে অনিল বললে, "কি বলুন ত?"

"বইয়ের যে কপিটি আমার হাতে প্রথমে আসবে সেটির অগ্নিসংকার ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করব।"

শুনে অনিল হাসতে লাগল; বললে, "বইয়ের প্রথম পাতা থেকে নাম তুলে দেওয়া ত আপনার পছন্দ নয়, তবুও আপনার দু-একটি বইয়ে ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তার জন্যেও কিছু প্রায়শ্চিত্ত করেছেন নাকি?"

বললাম, "দেশলাই জ্বেলে করি নি, মনে মনে করেছি। সব পাপের ত এক প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে না। এখন জগতে একটা সামগ্রিক অবনয়নের যুগ চলেছে,—সব-কিছুর গতি নীচুর দিকে। তাই বইয়ের পাতার শিয়রে যারা এতদিন ছিল, তারা, হয় তলায় যেতে, নয় তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। প্রায় আধাআধি বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা তলায় নেমে গেছে; কোন-কোন বইয়ের নামও তলায় আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেছে। গল্পের বই থেকে গল্পের নাম, ও প্রবন্ধের বই থেকে প্রবন্ধের নাম বইয়ের ভিতরের

পাতাগুলি থেকে নির্বাসিত হয়েছে, গ্রন্থের নাম লোপ পেয়েছে। ফলে, একটি হালফ্যাশানে-ছাপা বইয়ের পাতার ওপর দিকটা হয়েছে টেকো বাঙালীর মাথার মতো—না আছে চুল, না আছে টুপি।"

সহাস্যমুখে অনিল বললে, "কিন্তু পৃষ্ঠাসংখ্যা নীচে নামানোতে ওপরটা ত খানিকটা সাফ হ'তে পেরেছে দাদা ?"

উত্তরে বললাম, "সাফ হ'তে পারাই ত একমাত্র কাম্য নয়। প্রত্যহ দাড়ি গোঁফ কামাবার সঙ্গে মাথাটা কামিয়ে নিলেও ত মানুষের ওপর-ভাগটা বেশ সাফ হ'তে পারে; কিন্তু উস্কখুস্ক থেকে আরম্ভ ক'রে ব্যাক-ব্রাশ, সোজা সিঁথি, বাঁকা টেড়ি প্রভৃতি নানাভাবে মাথা জবড়জঙ্গ ক'রে রাখতেই মানুষে ভালবাসে। তা ছাড়া, পৃষ্ঠাসংখ্যা পাতার তলায় থাকার চেয়ে ওপরে থাকলে দেখবার সুবিধে অনেক বেশি। আমার মতো যারা পুরু লেন্সের চশমা পরে, পাতার তলায় পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখতে গেলে তাদের বুকের সঙ্গে থুতনি ঠেকে যায়।"

"আপনার মতে তা হ'লে পাতার ওপর দিকটা কি রকম হওয়া উচিত ?"

"আমার মতে পৃষ্ঠাসংখ্যা থাকা উচিত ডান দিকের পাতার ডান পাশে, আর বাঁ দিকের পাতার বাঁ পাশে; গ্রন্থের নাম থাকা উচিত ডান ও বাঁ পাতার মধ্যিখানে; কিন্তু গ্রন্থ যদি গল্পের বই অথবা প্রবন্ধের বই হয় তা হ'লে বাঁ দিকের পাতার মধ্যিখানে থাকা উচিত গ্রন্থের নাম, আর ডান দিকের পাতার মধ্যিখানে থাকা উচিত হয় গল্পের নাম, নয় প্রবন্ধের নাম।"

অনিলের বোধ হয় এ সম্বন্ধে আরও দু-চারটে প্রশ্ন করবার

ছিল, কিন্তু তার সময় হ'ল না, হঠাৎ উত্তর দিকের দোর দিয়ে দমকা দক্ষিণে হাওয়ার মতো রাণী ও বাণী নামে দুটি বোন প্রবেশ ক'রে ঘরের আলোচনা-গুরু আবহাওয়াটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে দিলে। রাণী বড়, বাণী ছোট। রাণীর কাঁধের ওপর দিয়ে চামড়ার স্ট্র্যাপে ঝুলছে একটা ক্যামেরা।

ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে খুলে টেবিলের উপরে রেখে প্রণাম ক'রে রাণী বললে, "উপেনদাদা, আজ আপনার কতকগুলো ফোটো নেব।"

বললাম, "তেমন আক্রমণ যে করবে, তোমার কাঁধে ঝোলানো যন্ত্রটি দেখে খানিকটা সন্দেহ হচ্ছিল। দেখি তোমার ক্যামেরাটা।"

ক্যামেরা আমার কাছে একেবারে অপরিচিত বস্তু নয়। অল্প বয়সে কলেজে পড়বার সময়ে ফোটো তোলবার উগ্র নেশা ছিল; এখনও গৃহে আমার কনিষ্ঠ পুত্র কমলের একটা হ্যাণ্ড ক্যামেরা আছে। আমার ছিল স্ট্যাণ্ড ক্যামেরা।

রাণীর ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তার বিধি-ব্যবস্থা কল-কব্জা দেখে মনে হ'ল, জিনিসটি মূল্যবান এবং শক্তিশালী। বললাম, "তোমার এই ক্যামেবার পক্ষে আমি ঠিক প্রস্তুত নই রাণী।"

বিস্মিতকণ্ঠে রাণী বললে, "কেন ?

বললাম, "আমি যে আজ সকালে দাড়ি-গোঁফ কামাই নি, সে কথা তোমার দামী আর দক্ষ ক্যামেরা ফাঁস ক'রে দেবে।"

মাথা নেড়ে রাণী বললে, "না না, এমন কিছু দেবে না। আর যদিই বা একটু দেয় তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। অন্য একদিন দাড়ি কামিয়ে রাখবার নোটিস দিয়ে এসে ফোটো তুলব।

আজ যেমন আছেন ঠিক তেমনি।" ব'লে আমার হাত থেকে ক্যামেরাটা টেনে নিলে।

বললাম, "একটু সবুর কর। তোমাদের পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রথমে অপরিচয়ের আড়ষ্টতা নষ্ট করি। তারপর সহজ পরিবেশে ছবি উঠবে ভাল।"

অনিলের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললাম, "ইনি শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য,—'কলরোল' কাব্য-বইয়ের খ্যাতিমান কবি, উপন্যাস এবং গল্প রচনাতেও ইনি নিপুণ সাহিত্যিক।"

রাণী ও বাণীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললাম, "রাণী আর বাণী—এঁরা দুজনে সহোদরা বোন। রাণী বড়, বাণী ছোট। রাণী ডাকনাম, পোশাকী নাম শোভনা। কিন্তু ডাকনাম রাণীতেই ইনি বেশী পরিচিত। এই সাদাসিধে পোশাকের, সাধাসিধে কথাবার্তার, সাদাসিধে ভাবভঙ্গীর মেয়েটিকে দেখে তুমি বোধ হয় মনে করছ ইনি আই.এ. ক্লাসের, বড় জোর বি.এ. ক্লাসের একটি ছাত্রী ?"

স্মিতমুখে অনিল বললে, "সেই রকমই মনে করছিলাম, কিন্তু আপনার প্রশ্নর জন্যে মনে করছি, তার চেয়েও ইনি বেশী।"

বললাম, "কত বেশী, তার একটা ফিরিস্তি দিই শোন।"

মাথা নেড়ে অধীর কণ্ঠে রাণী বললে, "লাইট ক'মে গেলে ছবি ভাল হবে না উপেনদাদা,—বাজে কথা আপনি বন্ধ করুন।"

বললাম, "যা বলতে উদ্যত হয়েছি, তার মধ্যে যে কথা তুমি বাজে বলবে, সে কথাই আমি বিনা আপত্তিতে প্রত্যাহার করব। ধর, আমি যদি বলি, তোমার মতো একটি অল্প বয়সের মেয়ে উপস্থিত লেডী ব্রাবোর্ন কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টের

অধিকর্ত্রীর ( Head of the Department-এর ) দায়িত্বপূর্ণ গৌরবময় পদ অধিকার ক'রে আছে,—সেটা বাজে কথা হবে? বল হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রত্যাহার করছি।"

স্মিতমুখে রাণী চুপ ক'রে রইল; আপত্তি করা চলল না।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে অনিল বললে, "বলেন কি দাদা!"

বললাম, "বলছি কি তবে? দুর্দান্ত মেয়ে! তুমিই বল, দুর্দান্ত কি-না?"

হাসিমুখে অনিল বললে, "যে অর্থে আপনি দুর্দান্ত শব্দ ব্যবহার করছেন, সে অর্থে নিশ্চয়ই দুর্দান্ত।"

বললাম, "কেন দুর্দান্ত বলছি তার কারণ শোন। এই মেয়েটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিওর ফিজিক্সে এম্.এস্-সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে; বাণীর মুখে শুনেছি মাত্র দু নম্বরের জন্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে নি; তারপর, অর্জন করেছে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ; হয়েছে মেয়েটি মোয়াট মেডালিস্ট; অধিকার করেছে ফুলব্রাইট-স্মিথ-মুন্দ্-স্কলারশিপ; আমেরিকায় গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হাই এনার্জি ফিজিক্সে বৎসর দেড়েক কাজ ক'রে পদার্থবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছে; তারপর দেশে ফিরে লেডী ব্রাবোর্ন কলেজে পদার্থবিদ্যায় হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট হ'য়ে ডি-ফিল্ উপাধির থিসীস্ অর্পণ করেছে। আজকের শ্রীমতী রাণী যে, অচিরের ডক্টর রাণী, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আচ্ছা বল ত, এতে যদি দুর্দান্ত না হবে ত খালি প্রজাপীড়ন করলেই কি হবে?"

হাসিমুখে অনিল বললে, "অকাট্য।"

হঠাৎ দেখি ফুট চার-পাঁচ দূরে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি ক্যামেরা বাগিয়ে রাণী ভিউ-ফাইণ্ডারে দৃষ্টি অর্পিত করেছে। একটু ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, "আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। চেহারাটা একটু—"

ক্লিক্।

"তুলে নিলে?"

হাসিমুখে রাণী বললে, "নিলাম বইকি।"

"এই জংলী চেহারায়?"

"জংলি কি রকম?"

"মাথা উস্কখুস্ক, গায়ে গেঞ্জি।"

রাণী বললে, "ঘরে ঢুকে আপনাকে যেমন পেয়েছি, সেইটেই ত হ'ল আমার প্রথম ছবি। ভয় নেই, একটা পুরো ফিল্ম-রোল এনেছি,—দরকার হ'লে সবটাই আপনার জন্যে খরচ করব। এবার তুলব আঁচড়ানো মাথা আর গায়েও জামা-দেওয়া ছবি।"

পরে পরে অনেকগুলো ছবি তোলা হ'ল,—কোনটা বাণীকে সঙ্গে নিয়ে, কোনটা অনিল প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে। ইত্যবসরে ঘরে অনেকে এসে হাজির হয়েছিল, তাদের সঙ্গে ক'রে কয়েকরকম গ্রুপও তোলা হ'ল। শেষ ছবি তোলা হ'ল স্বয়ং রাণীকে পাশে নিয়ে। এ ছবির স্ন্যাপ নিলে আমার কনিষ্ঠ পুত্র কমল।

রাণীর ক্যামেরাটি খুব মূল্যবান; ইউরোপে নিজে পছন্দ ক'রে কেনা। ফোটো তোলার পালা শেষ হ'লে রাণীকে বললাম, "এতগুলো যে ছবি তুলে নিলে তার মূল্য কিছু দাও।"

হাসিমুখে রাণী বললে, "কি দিতে হবে বলুন?"

"সেদিন যে স্প্যানিশ গানটা গেয়েছিলে, সেই গানটা গাও।"

"সেটা ভাল লাগে আপনার?"

"খুব ভাল লাগে।"

বিস্মিত হ'য়ে অনিল বললে, "স্প্যানিশ গান গাইবেন ইনি ?"

বললাম, "শুধু স্প্যানিশই নয়, ইংলিশ গানও গাইতে পারেন ; আমাদের ভারতীয় গানের ত কথাই নেই। নৃত্যকলাতেও সুদক্ষা। উন্মুক্ত হাতে বিধাতা এঁকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন।"

রাণীর দিকে চেয়ে বললাম, "ধর সেই স্প্যানিশ গান।"

ধীরে ধীরে সুরটা একটু গুন্‌গুনিয়ে নিয়ে সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠে রাণী গাইতে আরম্ভ করলে,—

Conese lunar que tienes
Cielito lindo junto ala boca
no se lo des a nadie cielito lindo
que a mi me toca.

Aih aih aih aih
Canta y no llores porque cantando se
a legran cielito lindo los corazones.

De la sierra morena
Cielito lindo vienen bajando
un par de ojitos negros cielito lindo
de contrabando.

Aih aih aih aih etc.

De tu casa a la mia
cielito lindo no hay mas que un paso.
ahora que estaneos solos
cielito lindo ren dame un abrazo.

Aih aih aih aih etc.

কতকটা আমাদের ইমন কল্যাণ রাগের অনুরূপ সুরের এই গানটি তার বিদেশীয় বৈশিষ্ট্যের অপরিচিত মাধুর্যের লীলায় ক্ষণকালের জন্যে আমাদের আবিষ্ট ক'রে রাখলে। গানটি প্রেম-সঙ্গীত; তার কাব্যার্থ এইরূপ,—হে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অধিকারিণী, তোমার মুখে যে চাঁদ (তিল) আছে, তা তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে দাও নি। কেঁদো না, গান করো; কারণ, গানই উদ্দীপিত করে মানুষের মনকে। বিষণ্ণ পাহাড়ের ওপার থেকে দেখা যাচ্ছে চোরাকারবারীর জোড়া কালো চোখ। তোমার বাড়ি থেকে এক পা এগোলেই আমার বাড়ি। আমরা দুজনে এখন একা; এই ক্ষণটিকে নিবিড় আলিঙ্গনে ভরিয়ে তোলো।

গানটির স্বরলিপি এইরূপ,—

II পা র্সা র্সা | ধা না -া | গা র্সা -া | ধা না না
co ne se | lu na r | que tienes | cie li —

গা র্সা -া | ধা ধা না | পা গা রা | না না না |
to lindo | jun to a | la bo ca | no se lo |

না -া ধা | হ্মা হ্মা গা | গা হ্মা হ্মা | পা পা হ্মা |
de s a | na die ci | e li to | lin do que |

হ্মা গা গা | রা সা -া | I
a mi me | ·to ca — |

I র্গা -া -া | র্রা -া র্সা | ধা -া -া | -া -া -া |
a i h | ai h aih | a ih — | — — — |

র্রা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্সা | র্গা র্সা -া | -া র্সা পা |
c a n | t ay no | llo re — | — s por |

ধা -া পা | ধা ধা পা | র্গা র্গা র্রা | র্রা না পা |
qu e can | tan do sea | leg ran ci | e li to |

ধা ধা পা | -া গা গা | রা সা সা | II
lin do lo | s co ra | zo ne s |

II প্র্সা র্সা র্সা | ধা না না | গা র্সা র্সা | ধা না না |
De — la | sie r ra | mo re na | cie li — |

গা র্সা -া | ধা ধা না | পা গা ঋা | না না না |
to lin do | vi e nen | ba jan do | un par de |

না না ধা | ক্ষা ক্ষা গা | গা ক্ষা ক্ষা | পা পা ক্ষা |
o ji tos | neg ros ci | e li to | lin do de |

ক্ষা গা গা | ঋা সা -া | I
— con tra | ban do — |

শেষ স্তবক Detu casa a la mia-র সুর De la sierra morena স্তবকের অনুরূপ।

গান শেষ হ'লে ক্ষণকাল আলাপ-আলোচনার পর উঠে দাঁড়িয়ে বাণী বললে, "চললাম উপেনদা। এবার একদিন ফোটোগুলোর প্রিণ্ট নিয়ে আসব।"

বললাম, "এস।"

রাণী ও বাণী প্রস্থান করলে বললাম, "কি অনিল, বইয়ের পাতা-সাজানোর আলোচনা আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করবে, না, তার পথ স্পেন দেশের মুখের তিল আজকের মতো মেরে দিয়েছে?"

উঠে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে অনিল বললে, "মেরে দিয়েছে ব'লেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, চলি দাদা।"

বললাম, "এস।"

রাণীর মতো বিদুষী এবং নানা গুণে বিভূষিতা আর-কোনও মেয়ে আমি যে দেখি নি, সে কথা, ধরা যাক, জোর ক'রে হয়ত বলতে পারি নে; কিন্তু এই সব দুর্লভ গুণকে অতিক্রম ক'রে তার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের যে সুমিষ্ট অবলীলা আছে, তা সত্যিই দুর্লভ;—আর সেই জন্যেই তার প্রতি আমি একটি সম্ভ্রমমিশ্রিত আত্মীয়তা অনুভব করি।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ফোটো তোলার বৈঠকের দিন রাণী ছিল শ্রীমতী রাণী ধর; আর সেদিনকার বৈঠকের বিবরণ লেখবার আজকের দিনে সে ডক্টর রাণী ধর। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সে ডি-ফিল্ উপাধিতে স্বীকৃত হয়েছে। সেদিনকার বৈঠকে রাণী ছিল বি.এ. পরীক্ষার ছাত্রী; এখন সে বাংলায় এম্.এ. শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে।

সকালে ঘুম ভাঙা থেকে মনটা কেমন একটা অকারণ বৈরাগ্যে মেদুর হ'য়ে আছে। এমন মাঝে মাঝে আমার হয়। দুঃখের কোনো কথা নেই, শোকের কোনো কারণ নেই, হারানোর কোনো রিক্ততা নেই; অথচ মনে হয়, কিছুই কিছু নয়, সব মিছে।

জীবনে পাই নি অনেক; যা পেয়েছি তাও কম নয়। তবুও যা পেয়েছি তার মূল্যমান অনেক সময়ে অযথা হ্রাস পেয়ে পাওয়া-না-পাওয়াকে এক ক'রে দেয়; মনে হয়, যা না-পেয়েছি তা পেলেই বা কি এমন লাভ হ'ত, আর যা পেয়েছি তা না পেলেই বা কি এমন অভাব ঘটত!

যৌবনকালে একটা বিচিত্র চিন্তা মাঝে মাঝে আমাকে পেয়ে ব'সে পীড়ন করত। সে চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার লাভ করবার জন্যে নিজেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম, কিন্তু সহজে পেরে উঠতাম না। সে চিন্তা মহারিক্ততার মহাশূন্যতার চিন্তা। কল্পনা করতাম, কিছুই যদি না থাকত তা হ'লে কেমন হ'ত?—যদি ইহলোক পরলোক না থাকত; ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা না থাকত; বস্তু অবস্তু না থাকত; আলো অন্ধকার না থাকত; সময় থাকত না, সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান থাকত না; এমন কি, কিছু না থাকলে যে-শূন্যর থাকা উচিত, সেই মহাব্যোমও থাকত না; অর্থাৎ কোনো মুহূর্তে কোথাও যদি কিছুই না থাকত, তা হ'লে কেমন হ'ত? স্থান ও কালের ধারণা মস্তিষ্কের মধ্যে বজায় রেখে সে কথা কল্পনা করতে মনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতাম।

আজকাল আর সে উদ্ভট কল্পনা আমার মনকে নিপীড়িত করে না; কিন্তু ধূমকেতুর ন্যায় মাঝে মাঝে যে হালকা বৈরাগ্য মনের আকাশে দেখা দেয়, তা বোধ হয় যৌবনকালের সেই মহারিক্ততার চিন্তারই পুচ্ছ।

"আসতে পারি?"

"এস, এস।"

স্মিতমুখে ঘরে প্রবেশ করলে বাসন্তী বাগচী।

বাসন্তীর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়; সে পরিচয় প্রধানতঃ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। মিষ্টি কণ্ঠে বাসন্তী গান গায়, মিষ্টি তার আকৃতি, মিষ্টি প্রকৃতি। প্রসিদ্ধ যন্ত্রশিল্পী শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাসন্তীর মামা। সুতরাং, অন্ততঃ মাতৃ-মাতামহর দিক থেকে সঙ্গীতের উপর তার একটা বংশগতি আছে।

দু-চারটে সাধারণ কথাবার্তার পর বাসন্তী বললে, "উপেনদাদা, সে গানটা আমার ঠিক হয়েছে কি-না, একবার দেখবেন?"

বললাম, "কোন্ গানটা?"

বাসন্তী বললে, "বেহাগ রাগের আপনার তৈরি যে গানটা কয়েকদিন আগে আপনার কাছে শিখে গিয়েছিলাম,—'শুন, শুন সখী।'

আমি গান শুনতে ভালবাসি ব'লে গান শেখবার ছল ক'রে বাসন্তী মাঝে মাঝে আমাকে গান শুনিয়ে যায়। সেটা আমি বুঝি, বোধ হয় সেও বোঝে। স্বভাবসৌজন্যের গুণে সে আমাকে শিক্ষকের মর্যাদা দেয়।

বললাম, "আচ্ছা, গাও,—শুনি।"

হার্মোনিয়মটা বার ক'রে বাসন্তী গান ধরলে,—

শুন, শুন সখী, কহি কানে কানে,
যে কথা লুকানো আছে প্রাণে প্রাণে ॥
নিবিড় নীরব সুগভীর কথা,
যে কথা কেবলি মরম জানে।
যে কথা গোপনে ছিল নীলাকাশে
সে কথা ভাসিছে মালতীর বাসে,
যে ছিল প্রতিকূল, হইল শিথিল
না জানি কেমনে কিসের টানে।
শুন, শুন ধনী, বেহাগ রাগিণী
তন্দ্রা-স্বপনবিধায়িনী ;—
আরোহী অবরোহী শাস্ত্র লীলায়িত
সা-গা-মা পা-নি-সা নি-পা-মা গানে ॥

গান শেষ হ'লে বললাম, "চমৎকার হয়েছে।"

দু-তিন জায়গায় একটু তফাত হচ্ছিল, ঠিক ক'রে দিলাম।

গানটি প্রধানতঃ আমার রচিত এবং সুর দেওয়া হ'লেও এর ষোল আনা মালিকানা আমার নয়। 'শুন, শুন ধনী' হ'তে 'নি-পা-মা গানে' পর্যন্ত শেষার্ধ একটি হিন্দী লক্ষণ-গীতের অবলম্বনে একটু রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছি। হিন্দী অংশটি এই,—

কহে সাদত গুণী রাগ বিহাগ
শুনো রসিক নবাব ;
আরোহী অবরোহী শাস্ত্র বখানত—
সা-গা-ম পা-নি-সা নি-পা-মা গা-সা।

আরও গোটা তুই গান শুনিয়ে বাসন্তী যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, "এদিকে এলে আমার এখানে ঢুঁ মেরো বাসন্তী।"

হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে বাসন্তী বললে, "এদিকে না এলেও আপনার এখানে আসব।"

বললাম, "আজ এসে ভাল করেছ।"

"কেন?"

"তোমার গান গাওয়া আমার বৈঠকের মধ্যে থেকে গেল।"

"কিন্তু আমি ত এর আগে অনেক গান আপনার বৈঠকে গেয়েছি, অনেক গান পরেও গাইব।"

"আমার বৈঠকে গাও নি, ঘরে গেয়েছ; পরে যা গাইবে তাও আমার ঘরেই গাইবে, বৈঠকে গাইবে না।"

বিস্মিত হ'য়ে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"কারণ, আমার ঘরে লোকের সমাগম হ'লেই বৈঠক বসে না, আর বৈঠক বসাবার জন্য লোকের যে একান্ত আবশ্যক, তাও নয়। আজ তুমি আসবার আগেও বৈঠক চলেছিল, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ আজকের বৈঠকে সে পর্যন্ত আসে নি।"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে বাসন্তী বললে, "কিন্তু ভবিষ্যতে কোনদিন আপনার বৈঠক চলছে, ঘটনাক্রমে আমি এসে গান গাইলাম, এমনও ত হ'তে পারে।"

"না, তেমন ঘটনাক্রম হবে না।"

"কেন?"

"সে কথা পরে জানতে পারবে। আচ্ছা, এস।

এ কথার পরও টিঁকে থাকতে পারে সে দার্ঢ্য বাসন্তীর মতো ভালমানুষ মেয়ের নেই। সে চ'লে গেল বিস্মিত হ'য়ে, বোধ হয় একটু দুঃখিতও হ'য়ে।

ভাবলাম, আশীষের একটু খোঁজ নিয়ে আসি; অনেক দিন তার সাড়াশব্দ নেই।

আশীষ—অর্থাৎ গল্পকার আশীষ গুপ্ত। বাংলা দেশের জনতা তাকে কতটা জানে বলতে পারি নে; কিন্তু অল্প যে কয়েকজন তাকে জানে তাদের তার প্রতি, আমার মতো, যতটা করুণা আছে, বোধ হয় ততখানিই আছে ক্রোধ। নিজের মধ্যে প্রচুর মসলা জমিয়ে সে রইল স্তিমিত হ'য়ে ব'সে, অথচ যাদের পুঁজি আধ পোয়া বারুদ আর সিকি পোয়া ক্লোরেট-অফ-পটাশ তারা দপদপিয়ে জ্ব'লে বেড়াচ্ছে। মানুষ যে নিজে নিজের কতটা বৈরসাধন করতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে আশীষ গুপ্ত। তার পরম শত্রুও তার আচরণ দেখে বোধ হয় থ মেরে গেছে। জোরজার ক'রে তাকে দিয়ে যে উপন্যাসটা লেখাতে আরম্ভ করিয়েছিলাম সেটা যদি শেষ হ'ত, তা হ'লে হয়ত তা বাংলা কথা-সাহিত্যের একটা সম্পদ বাড়ত।

"কি হচ্ছে উপেন?"

"আরে, এস এস, শ্রীমান্ বিষ্ণু নাগ এস। তার পর, কি মনে ক'রে?"

বিষ্ণু নাগ বললে, "তোমার কাছে আসি তোমাকেই মনে ক'রে, আর কিছু মনে ক'রে নয়।"

বললাম, "তা একশোবার। তোমার মতো আপনার আমার ত বেশি কেউ নেই। দেখ, অনেকে তোমার কথা আমাকে

জিজ্ঞাসা করে ;—বলে, কথায় কথায় ও ভদ্রলোক আপনাকে 'ডাউন' করেন, কে উনি ? আপনাব কেউ হন ?"

পুলকিত হ'য়ে বিষ্ণু নাগ জিজ্ঞাসা করলে, "কি বল তুমি ?"

"বলি নে কিছু, হাসি। এক-একবার ভাবি বলি, বিষ্ণু নাগ আমার বড় কুটুম হন।"

"বাঃ, চমৎকার ত ! আসলে তুমি ত হচ্ছ আমার বড় কুটুম।"

বললাম, "সে ত তুমিও জান, আমিও জানি ; কিন্তু কতক কতক লোক জানছে তুমি আর আমি ভায়রাভাই।"

"কি ক'রে ?"

"তোমার সঙ্গে আমার বিবাদের কোনো কোনো সময়ে অনিল ভট্টাচার্য উপস্থিত থেকেছে ত। অনিলকে কেউ কেউ তোমার-আমার সম্বন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করে। ও বলে, 'ঠিক ত বলতে পারি নে, তবে দুজনের কথাবার্তা শুনে, ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় দুজনে ভায়রাভাই-টাই হবেন'।"

বিষ্ণু নাগ আর আমি এক সঙ্গে হেসে উঠলাম।

"একটা সংবাদ আছে বিষ্ণু।"

উৎসুক হ'য়ে বিষ্ণু নাগ জিজ্ঞাসা করলে, "কি সংবাদ ?"

"আজ আমার বৈঠকের শেষদিন,—তুমি আমার শেষ বৈঠকী।"

"সে কি ! এরই মধ্যে বৈঠক শেষ করছ ?"

"এরই মধ্যে কোথায় ? আজ ত দ্বাবিংশ অধিবেশন হ'ল।"

"কিন্তু পঞ্চাশত্তম অধিবেশন না হবার কি কারণ আছে ? তোমার বৈঠকে যবনিকাপাত এরই মধ্যে হ'তে পারে না, একে চালু রাখতেই হবে। তা ছাড়া, যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্প্রতি

ঘটেছে, সেগুলো শোনবার অধিকার বৈঠকীদের নিশ্চয় আছে। ধর, তোমার সাম্প্রতিক ভাগলপুরে গিয়ে সেখানকার শাখা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিন দিনের উৎসবে সভাপতিত্ব ক'রে ফিরে আসবার মধ্যে পথে ও ভাগলপুরে যে-সব কৌতুকজনক ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো বৈঠকের রেকর্ডে থাকা উচিত।"

বললাম, "ভাগলপুরে আমার পক্ষে সবচেয়ে বিস্ময়ের আর আনন্দের কথা হয়েছিল ১৯১৩ সনে সেজদার বৃহৎ বাড়ির যে ঘরের যে ঈশান কোণে দিনের পর দিন রাতের পর রাত সমস্ত বছর কাটিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র নির্মল ঠিক সেই ঘরের সেই ঈশান কোণেই আমার পালঙ্ক স্থাপন করেছেন। ইচ্ছে ক'রে নয়, সে কথা মনে পড়ায় নয়,—এমনই। আমার পালঙ্কের সামনা-সামনি অপর পাশে আমার কলকাতা ছাড়া থেকে আরম্ভ ক'রে কলকাতায় পৌঁছনো পর্যন্ত আমার সর্বক্ষণের সকল স্থানের নিত্যসাথী অনিলের পালঙ্ক। ঘটনাক্রমে সে পালঙ্কে আমার শয্যার, আর ঈশান কোণের পালঙ্কে অনিলের শয্যার ব্যবস্থাও ত হ'তে পারত। কিন্তু দৈব সদয় হ'য়ে ঠিক ব্যবস্থাটি করেছে।...এত ভাল লাগত সেই কোণটিতে সেই পূর্ব দিকে মাথা ক'রে শুয়ে! মনে হ'ত, সেই কোণটি যেন আমাকে বলছে, 'ওরে, দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পরে আবার তোকে তিন দিনের জন্যে আমার বেষ্টনে ফিরে পেয়েছি!'...সারাদিন সভাসমিতি হই-হুল্লোড় ক'রে বাড়ি ফিরে আহারের পর অনিল ও আমি নিজ নিজ শয্যায় শুয়ে পড়তাম। ক্লান্ত অনিলের নিদ্রা ঘোষিত হ'তে এক মিনিটও বিলম্ব হ'ত না; আমি কিন্তু ক্ষণকাল সেই কোণটির সঙ্গে জড়িত

অনেক দিনের অনেক সুখদুঃখ-কৌতুকের স্মৃতি নিয়ে মশগুল থাকতাম।···অনিল আমার অন্তরের এ আনন্দের বার্তা জানত, আর আমার আনন্দ দেখে পুলকিত হ'ত।"

বিষ্ণু বললে, "এসব কথা 'শেষ বৈঠকে'র নথিপত্রে থাকবে না? বিশেষতঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-কথিত চাঁপাফুলের অলৌকিক কাহিনী আর বনফুল-দম্পতির হাস্য-কৌতুকের সঙ্গে নিরলস সেবা-যত্নের কথা? তা ছাড়া, তোমার পাদুকা-সংবাদ, যা ভাগলপুরে প্রায় প্রত্যেক সভায় কৌতুক সঞ্চারের একটা বিশেষ দফা হ'ত; আর, ফেরবার পথে বোলপুর স্টেশনে তোমাদের কামরায় অচিন্তিতভাবে সৈয়দ মুজতবা আলির আবির্ভাব থেকে শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত তিনজনে মিলে আলাপ-আলোচনার কৌতুকময় কাহিনী—এ সব 'শেষ বৈঠক' থেকে বাদ পড়বে?"

"বললাম, পড়ল ত।"

বিষ্ণু বললে, "কিন্তু শেষ বৈঠকের পরের বৈঠকে এ সকল কথা তোমাকে বলতে হবে উপেন।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "শেষ বৈঠকের পরে আবার বৈঠক হবে না-কি?

বিষ্ণু বললে, "কেন হবে না? শেষের পরে নূতনের আরম্ভ—এ ত আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার দৌড়ে সর্বদা বহু বিষয়েই দেখতে পাই। এমন কি, মৃত্যুর পর নূতন জীবনের বিকাশকেও আমরা—ভারতীয়রা—অবিশ্বাস করি নে। তোমার 'শেষ বৈঠকে'র পরে 'শেষের বৈঠক' হবে; আর, তারপর আবশ্যক হ'লে 'সবশেষের বৈঠক'ও হ'তে পারবে।"

বিষ্ণুর কথা শুনে বললাম, "ভবিষ্যতের সম্ভাবনাব আকাশে তোমার 'শেষের বৈঠক' আর 'সবশেষের বৈঠক' পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ুক, আপাততঃ আমি এখানেই 'শেষ বৈঠকে'র দরজায় অর্গল দিলাম।"

সমাপ্ত